কল্কি অবতারের খোঁজে

আর.এ. প্রামাণিক

ঈশ্বর, অবতার ও ধর্ম ঃ

সৃষ্টির আদিতে যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি বিদ্যমান এবং সৃষ্টির ধ্বংসের পরেও যিনি বিদ্যমান থাকবেন সেই শ্বাশত, অবিনশ্বর ভগবানকে জানার আগ্রহ আমাদের চিরন্তন।তাঁর করুনা, দয়া এবং ভালবাসাতে আমরা বেঁচে আছি। আমাদের জীবন, সম্পদ সবকিছু তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের জীবন অন্ধকারের মধ্যে পতিত হবে নিমিষেই। আমাদের সেই পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তা যাঁর অসীম দয়ায় আমরা আমাদের জীবন লাভ করেছি এবং এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি তাঁর করুনা এবং ভালবাসা সম্পর্কে কি আমরা অবগত? আমরা কি কোনদিন তাঁর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি বা তাঁর দেখানো নির্দিষ্ট পথে চলেছি? কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং তার উপাসনা করা। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা কি সরাসরি সৃষ্টিকর্তাকে জানাতে পরি? পৃথিবীতে জন্মলাভকারী প্রতিটি প্রাণী তথা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর আছে, যেমন খনিজ স্তর, প্রাণী জগতের স্তর, মানুষের জ্ঞানের স্তর, অবতারদের জ্ঞানের স্তর এবং সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের স্তর। নিচু শ্রেণীর স্তরের প্রাণীরা কোনদিন উচ্চ শ্রেণীর স্তরের প্রাণীদের সম্পর্কে সম্যকরুপে অবগত হতে পারে না। কিছু ছিক ধারনা পেতে পারে মাত্র। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষ প্রাণীজগত সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত তেমনি খনিজ জগত সম্পর্কেও। কিন্তু মানুষ অবতারের জ্ঞানের জগত এবং সৃষ্টি কর্তার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে কোনদিনই পুরো জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাদের তাঁদের জানার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়েজন সেই জ্ঞান আমাদের প্রদান করেন নাই। এই পৃথিবীতে বহু মানুষ অবতারের জ্ঞান এবং সৃষ্টি কর্তার জ্ঞানের জগত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন সময় সফলকাম হয় নাই। কিছু কিছু ধারনা পেয়েছে মাত্র। আমরা যেহেতু মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছি তাই আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ভগবানকে সরাসরি জানার ক্ষমতা বা জ্ঞান আমাদের নাই। ভগবানকে আমরা ভালবাসি, তিনিও আমাদের ভালবাসেন। তাই তাঁকে জানার আগ্রহটা আমাদের খুব বেশী। কিন্তু তাঁর রহস্যময় ক্রিয়া-কলাপ আমাদের ধারণার বাইরে। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের লালন পালন করছেন, যার দযায় আমরা আমাদের জীবন লাভ করেছি, আমারা এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি তাঁর প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নেই? তাঁর প্রতি কি আমাদের কোন ভালবাসা নেই? প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ অবশ্যই বলবেন যে, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

যদি আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসতে চাই, তার কাছ থেকে আমরা আরও কিছু পেতে চাই, তার করুণা লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল সৃষ্টিকর্তাকে জানা, আমরা যদি সৃষ্টিকর্তাকে ভালভাবে না জানাতে পারি তাহলে আমাদের ভালবাসাও পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হবে না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তো অসীম। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, আমাদের বোধশক্তির উর্দ্ধে।

এ বিষয়ে একটু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে যে সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম। যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে, এই পৃথিবীর সকল প্রাণীই সূর্য্যকে ঘিরে তথা সূর্য্যের উপরে নির্ভর করেই বেঁচে আছে। আমরা মানুষ হিসাবেও সূর্য্যের উপরে নির্ভর করেই বেঁচে আছি। সূর্য্য নিজেকে উজাড় করে আমাদের আলো দিচ্ছে আর আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখছে। যদি এক মুহুর্তের জন্য সূর্য্য তার এই দান থেকে আমাদের বঞ্চিত করে তাহলে শুধু আমরাই না সমস্ত প্রাণীকূল সংগে সংগে জীবন হারাবে। কিন্তু অবস্হাটা দেখেন যেই সূর্য্য আমাদের এত উপকার করছে আমরা কি তার কাছাকাছি যেতে পারি? সূর্য্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? নিশ্চই না। তবুও যদি আমরা জোর করে সূর্য্যের কাছে যেতে চাই তাহলে কি হবে? সূর্য্যের প্রচন্ত তাপে আমরা পুড়ে মারা যাব। কারণ

সূর্য্যের প্রচন্ড তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু এই সূর্য্যই আমাদের আলো দেয়, তাপ দেয়, শক্তি দেয় আর দেয় জীবনীশক্তি। সেটা কিভাবে আমাদের দেয়? তার কিরণের মাধ্যমে। সূর্য্যের কিরণই আমাদের সংগে সূর্য্যকে সংযুক্ত করে।

ঠিক তেমনি আমরা মানুষ হিসাবেও আমাদের ক্ষমতা নির্ধারিত। ঈশ্বর সকল প্রকার শক্তির উৎস। তিনি আমরা যা চিন্তা করি, বা কল্পনা করি তার চাইতে মহান এবং বৃহৎ তার কর্মকান্ড। মানুষের বিবেক বুদ্ধি তার কোন ক্রিয়া কলাপেরই চিন্তা বা বর্ননা করতে পারে না। তিনি অজ্ঞাত অস্তিত্ব।তাঁর দয়া, ভালবাসা করুনা ও আশীর্বাদে আমরা জীবন ধারন করে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি। ঈশ্বরের সৃষ্টি সূর্য্যের কাছাকাছি গিয়ে যদি আমরা পুড়ে মারা যাই তাহলে তাঁর কাছে আমরা কিভাবে যেতে পারি। তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি সবার উপরে অবস্হান করেন।

তবে কি মানুষ সৃষ্টিকর্তা তথা ভগবানকে জানতে পারবে না? ভগবান কি তাঁকে জানার কোন পথই খোলা রাখেন নাই?

হ্যাঁ, তিনি তাঁকে জানার, চেনার এবং ভালবাসার পথ আমাদের জন্য রেখেছেন। আমরা তাঁর কাছে যেতে পারিনা কিন্তু তিনি আমাদের কাছে উপস্হিত হতে পারেন। সূর্য্য যেমন তার কিরণের মাধ্যমে তার কিছু শক্তিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে আমাদের প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছেন, ঠিক তেমনি করেই পৃথিবীতে ঈশ্বর অবতারগণের মাধ্যমে তাঁর আলোকে আমাদের কাছে প্রেরণ করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সেই সঠিক, সরল, সহজ, এবং নির্ভেজাল পথ হল তাঁর অবতার বা বার্তাবাহক।

এই বার্তাবাহক ছাড়া তাঁকে জানার আর কোন পথ নেই? ঈশ্বরীয় অবতারগণই ভগবানের কাছে যাবার একমাত্র পথ বা রাস্তা। তাঁদের সহযোগীতা ছাড়া মানুষ কোনদিনই ভগবানের সন্ধান্ত পেত না। আর যদি আমরা ভগবানের সন্ধান্ত না পেতাম তাহলে এই পৃথিবী অজ্ঞানতার সাগরে ভাসত, ডুবে থাকত এক গাঢ় অন্ধকারে। প্রাণহীন হয়ে যেতাম আমরা। এখানে পরিস্কার যে যদি আমরা ঈশ্বর যে অবতারকে প্রেরণ করেছেন বা ভবিষ্যতে আরও করবেন তাঁকে যদি স্বীকার করি তাহলে আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকেই স্বীকার করি।

পৃথিবীর মানুষ যখন ভগবানের বাণী ভূলে যায়, অবতারগণকে অবহেলা করে, মিথ্যা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়, ঈশ্বরীয় বাণী হারিয়ে ফেলে হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, শুন্য হয়ে যায়, মানুষ সংকটে পড়ে, দাংগা, বিবাদ, হানাহানিতে প্রতিটি ধর্মের লোক তাদের নিজ নিজ ধর্মকে হাজারো শ্রেণীতে বিভক্ত করে। মানুষে মানুষে কোন সম্মানবোধ থাকে না। তখই

ভগবান যুগে যুগে আমাদের কাছে তাঁর অসংখ্য বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। যেন আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। যখন একজন অবতার ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার বার্তা নিয়ে আসেন তখন তার সাথে সাথে অনেক নুতন নিয়ম কানুন আমাদের জন্য নিয়ে আসেন। তিনি হন মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক। তাঁর জ্ঞান হয় সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। তিনি কোন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহন করেনা না। তিনি সমস্যা জর্জরিত মানুষজাতিকে সমস্যা সমাধানের পথ দেখান। তিনি হন বিশ্ব- সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বশান্তির আদর্শবাহক।

এ বিষয়ে বর্তমান যুগের অবতার বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন,'' অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত ঈশ্বর-জ্ঞানের দ্বার মানবজাতির নিকট বন্ধই থাকিবে। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেহই পরমেশ্বরের পবিত্র দেবসভায় প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিবে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণা এবং তাঁহার সস্নেহ-সহানুভূতির নিদর্শন স্বরুপ তিনি ঐশী পথ-নির্দেশ দিবার নিমিত্ত মানবের মধ্যে পবিত্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বরের দৈব মিলনের প্রতীক তাঁহারাই। তাঁহাদেরই পরম পবিত্র সত্ত্বাকে ঈশ্বর স্বয়ং আত্মজ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। যে তাঁহাদের স্বীকার করিয়াছে সে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে।

যে তাঁহাদের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, সে ঈশ্বরের সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছে। যে তাঁহাদের বিশ্বাস করে নাই, সে ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করে নাই। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরাভিমুখী পথ, তাঁহারা এই ধূলির জগতকে উর্ধ্বলোকের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছেন, ঐশ্বরিক সত্যের মানদন্ডে স্বর্গ ও মর্ত্যের সকলকে যুক্ত করিয়াছেন। মানষের মাঝে তাঁহারাই ঈশ্বরের স্বয়ংপ্রকাশ, পরমেশ্বরের সত্যতার সাক্ষ্য এবং ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় চিহ্ন।''
''গ্লিনিংস, একবিংশ অধ্যায়,৪৯-৫০ পাতা)

মানুষ যখনই সৃষ্টিকর্তাকে ভূলে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে ভগবান তখনই তার দূত অবতাররুপে মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন। আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই যে,সনাতন ধর্মমতে ৩৩ কোটি দেবতা এসেছিলেন মানুষকে-ঈশ্বরকে পাবার কাজে সাহায্য করার জন্য। এত দেবতার কি প্রয়োজন ছিল? সৃষ্টিকর্তা একজনকে দিয়েই তো মানুষকে একবারে সঠিক পথ দেখাতে পারতেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তা করেন নাই। তিনি যুগে যুগে যখনই অবতারের প্রয়োজন হয়েছে তখনই আমাদের পথ দেখানের জন্য তাঁর অবতার পাঠিয়েছেন। এই জন্য দেবতাদের সংখ্যা এতবেশী। সনাতন ধর্মের ৩৩ কোনটি দেবতাদের মধ্যে ১০জন ছিলেন অবতার।

এ বিষয়ে আমরা যদি একটি উদাহরণ দেই তাহলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে। আমরা যদি লেখাপড়া করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা কোন ক্লাসে ভর্তি হব? অবশ্যই প্রথম শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেনীতে শিক্ষক আমাদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে অ, আ, ক, খ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমরা অনেক সময় এই অক্ষরগুলো মনে রাখতে পারি না তাই প্রত্যেক বর্ণের সাথে একটি করে ছবিও দিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষকের দারুন উৎসাহ এবং আমাদের একান্ত মনোনিবেশের কারণে এক বছর পরেই আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উর্ত্তীর্ণ হই। এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকে আরও একজন শিক্ষক, পূর্ববর্তী শিক্ষকের শিক্ষার ওপর নির্ভর করেই নুতন পাঠ শুরু করেন এবং আরও কিছু নুতন শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এভাবেই আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের শিক্ষায় আমরা আমাদের লেখাপড়া এবং চরিত্রের উন্নতি করে থাকি।

মনে করুন আমরা লেখাপড়া করতে করতে ৫ম শ্রেণীতে উঠলাম। তখন কি আমরা বলতে পারি, যে ১ম শ্রেণী বা ২য় শ্রেণীর শিক্ষা আমার প্রয়োজন নাই বা ছিল না? প্রথম শ্রেণীতে অর্জিত জ্ঞান কি আমার ভিতরে নাই? অথবা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের চাইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের মর্যাদা কি আলাদা? আমি শুধু প্রথম শ্রেণীর শিক্ষককে ভালবাসি ৫ম শ্রেণীর শিক্ষককে ভালবাসি না? নিশ্চই এ ধরনের কথা বুদ্ধিমানের লক্ষন প্রকাশ করবে না। কারণ সকল শ্রেণীগুলি একই বিদ্যালয়ের। বিভিন্ন শ্রেণীতে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। আমাদের বয়স, মেধা এবং ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষক কোন দিনই প্রথম শ্রেণীতে আমাকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষা দেন নাই বা দিলেও আমি বুঝতে পারতাম না। কারণ আমার সেই ধারণ ক্ষমতা ছিলনা। আমরা যে বয়সে, যে শ্রেণীতে, যে শিক্ষা লাভ করেছি সেই সই বয়সে সেটাই ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

এই অবস্হাটা ঠিক ধর্মের বেলাতেও একই রকমের। মানব জাতির বিভিন্ন বয়সে সৃষ্টিকর্তা আমাদের এইভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের অবতারগণই আমাদের পুরম পূজনীয় শিক্ষক।আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক। ঈশ্বরের রাজত্বে পথ চলতে আমাদের সাহায্য করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা জানি যে, মানুষের জীবনে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে এবং সেই সংগে সংগে তাদের ক্ষমতা, তাদের জীবন যাপন, তাদের সামাজিক অবস্হান উন্নত হচ্ছে। সে কারণেই ঈশ্বর যুগে যুগে তার অবতার আমাদের কাছে প্রেরণ করে নুতন নুতন বিধান বা নিয়ম প্রেরণ করেছেন। যা পৃথিবীর উন্নতি সাধনে অবদান রাখছে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ভালবেসেছি বলেই যে ঐ শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর শিক্ষককে ভালবাসবব না বা তার শ্রেণীতে যাব না এটা মোটেই কাম্য নয়। প্রত্যেক শিক্ষকই চান যে, আমরা যেন তার শিক্ষা গ্রহন করে উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। তার মানে এই নয় যে, এক শিক্ষক অপেক্ষা অন্য শিক্ষকের জ্ঞান বা সম্মান কমে

যাবে। কারণ শিক্ষকগণ সকলেই সমান জ্ঞানী এবং সমান সম্মানের অধিকারী। আমাদের যখন যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তারা সেটুকু দিয়েছিলেন বলেই তারা জ্ঞানী। আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, এভাবেই প্রত্যেক ঈশ্বরীয় শিক্ষক তাঁর পুর্ববর্তী শিক্ষকের শিক্ষাদান ক্ষমতার এবং তাঁর জ্ঞান বিতরণের প্রশংসা করেছেন এবংতারা শপথ করে গেছেন যে, পরবর্তীকালে যথা সময়ে আবার একজন শিক্ষক এসে মানবজাতির জ্ঞানকে প্রগতির পথে আরও এগিয় নিয়ে যাবেন।

যদি আমরা ধর্মীয় ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় এক হাজার বছর পরপর একজন করে অবতার এসেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি নতুন জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। তাঁরা সবাই কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে এসেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই এসে মানুষকে বিপথ থেকে পথে ফিরিয়ে এনেছেন। তাদের ধর্মের বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসে নিয়ে গেছেন। মানুষ ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে।সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। উন্নতি করতে করতে আমরা আজ মনুষ্য শক্তির এক নুতন পর্যায়ে বসবাস করছি। অতীত যুগের চেয়ে বর্তমান যুগে আমাদের শক্তি এবং ক্ষমতা অনেক বেশী। বিগত যুগের অবতারগণকে ধন্যবাদ কারণ তারাই আমাদের উন্নতির পথে চালিত করেছেন।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, পৃথিবীতে এমন কোন অবতার নেই যিনি নিজে নিজে বানিয়ে কোন ধর্ম প্রচার করেছেন। প্রত্যেক অবতারই কিন্তু মানুষকে দয়া, প্রেম, ভালবাসা, একতা ও উন্নতির শিক্ষা দিয়েছেন। একেক জন অবতার তাঁর যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর আগমনের সময়কালে সেই শিক্ষাই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ছাড়া কোন অবতারই এই পৃথিবীতে কোন ধর্ম নিয়ে আসেন নাই বা সেটা সম্ভবও নয়। যখন কোন অবতার এসেছিলেন তাঁরা সেই যুগের সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছিলেন। কারণ পৃথিবীর অন্ধকার সময়েই অবতারগণ তাদের শিক্ষা নিয়ে আসেন আলোর দিশারী হিসাবে। কোন অবতার তাঁর নিজের ইচ্ছামত কোন ধর্ম বানিয়ে প্রচার করেন নাই। সকল ধর্মের উৎস একটাই। ইব্রাহীম, শ্রী কৃষ্ণ, মুসা, বুদ্ধ, যীশু, হযরত মোহাম্মদ কেউ কি বানিয়ে কোন ধর্ম প্রচার করেছেন?
না। সেটা কোন দিনও সম্ভব নয়। কারণ মনুষ্য তৈরী ধর্ম বেশী দিন পৃথিবীতে স্হায়ী হয় নাই বা হবেও না।

যদি তাঁরা একই উৎস থেকে ধর্ম পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের অনুসারীরা পরস্পরের শত্রু কেন? এর অন্যতম কারণ হল প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা যখন তাদের অবতারের প্রয়ান হয়। তখন ধর্মের ভিতরে নানা রকম ভাগ হতে থাকে। একেক ভাগ অন্য ভাগকে সহ্য করতে পারে না। তারা মনে কনের যে, সে নিজে যে ভাগে আছে সেটাই সঠিক অন্যগুলি বেঠিক। পৃথিবীতে আগত ধর্মের সময় যখন ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হতে থাকে তখন মানুষ ধর্মের মর্মকথা আস্তে আস্তে ভূলতে থাকে। এক সময় আসে তারা তাদের ধর্মের মূল বক্তব্যকে ভূলে গিয়ে নানা রকম প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা মনে করে তাদের ধর্ম সব চাইতে ভাল এবংসঠিক। অন্যগুলো খরাপ তথা সত্য নয়। এখান থেকেই মনে হিংসার জন্ম হয়। যখন মনে হিংসার জন্ম হয় তখনই শুরু হয় অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ। তখন মানুষ ভূলে যায় যে,আসলে ধর্ম মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা দেয় হিংসার শিক্ষা নয়।

একেক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে শত্রু মনে করে তার আরও একটি অন্যতম কারণ হল আমরা প্রত্যেক ধর্মের নিয়মের মধ্যে তারতম্য দেখতে পাই। আর সেটাই হলো সমস্ত গন্ডোগোলের মূল কারণ। কারণ আমরা ধর্ম কি তা জানিনা। শুধু জানি ধর্মের নিয়মকে। যদি দেখি যে, সেটা পূর্বের ধর্মের মতো নয়, তাহলেই শুরু হয় বিরুদ্ধাচারণ। মারামারি, হানাহানি ইত্যাদি মারাত্মক পরিস্থিতি যা এই একবিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগেও চলছে বেশ জোরে সোরে।

কিন্তু আমরা একবারও ভাবিনা কেন এক ধর্মের নিয়ম অন্য ধর্মের নিয়মের চাইতে আলাদা হয়? এর অন্যতম কারণ হল সভ্যতার ক্রমোন্নতি তথা সময়ের প্রস্থান। পৃথিবীর মানব ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে,মানুষ বর্তমানেযে সভ্যতার সুফল ভো করছে তা পূর্বে ছিল না। আমরা সবাই জানি যে, সৃষ্টির আদিতে মানুষ কত অসহায় ছিল। আমরা হলাম সেই মানুষের বংশধর যে, মানুষ আদিম যুগে রান্না করতে পারত না। তারা আগুন জ্বালাতে পারত না। পশু পাখি শিকার করে তারা কাঁচা মাংশই খেত। ফলে ব্যকটেয়িার আক্রমনে তারা পেটের পীড়া সহনানা রকম রোগে ভুগত। আজ যদি কোন মানুষ পশু পাখির কাঁচা মাংস খায় তাকে আমরা কি বলব? স্বাভাবিক মানুষ না অস্বাভাকি মানুষ?। নিশ্চই অস্বাভাকিক মানুষ। আমরা হলাম সেই মানুষ যাদের কোন বাড়ী ঘর ছিল না। আমরা থাকতাম পাহাড়ের গুহায়, গাছের ডালে বা অন্য কোন উঁচু স্হানে যেন, বাঘ, সিংহ আমাদের ধরে না খেয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে আমরা ঘর বানানেত শিখলাম। এখন ঐ মানুষ আমরাই বানাই পৃথিবীর সুউচ্চ অট্রালিকা। আমরা মহাসুখে সেখানে বাস করি। কোন সুস্হ মানুষ কি এখন গাছের ডালে, পাহাড়ের গুহায় বসবাস করবে। বাঘ, সিংহকে মানুষ এখন ভয় পায় না। বাঘ, সিংহই মানুষকে ভয় পায়। আমরা হলামসেই মানুষ যারা একদা কাপড় পরত না। পরবে কিভাবে তারা কাপড় তৈরী করতেইতো জানতো না। এখন যদি আপনি কাপড় ছাড়া বাইরে যান মানুষ কি বলবে? নির্ঘাত পাগল। কপালে জুটবে ইট পাটকেল। এগুলো আদিম সভ্যতার কিছু উদাহরণ। যা এখনো আফ্রিকার জংগলে কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু এখন মানুষ কি সেই অবস্থায় আছে না উন্নতি করেছে? যত দিন যাচ্ছে মানুষ ধীরে ধীরে তত উন্নতির দিকে যাচ্ছে। তাই এখন মানুষ আর আদিম যুগের মত অসহায় নেই। মানুষ এখন আর পাহাড়ে-জঙ্গলে বাস করে না। কাঁচা মাংস খায় না। তখন যে অবতার এসেছিল, যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিল সেটা ছিল সে যুগের জন্য। ঐ শিক্ষা বর্তমান যুগে অচল। যেহেতু সভ্যতার ক্রমোন্নতি হচ্ছে সাথে সাথে ধর্মেরও উন্নতি হচ্ছে। যেহেতু সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে এবং নিয়ম-কানুন পরিবর্তন হচ্ছে। সেইহেতু নুতন নিয়ম কানুন প্রণেতার প্রয়োজন। আমরা আমাদের দৈনন্দিন নিয়ম-কানুন বানাতে পারি বা পরিবর্তন করতে পারি।

কিন্তু স্বর্গীয় নিয়ম বা আইন পরিবর্তন করবে কে? স্বর্গীয় আইন পরিবর্তন করার অধিকার কি আমাদের আছে?

না। স্বর্গীয় আইন পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা মানুষের নাই। হ্যাঁ, মানুষ তার প্রয়োজনে অনেক সময় স্বর্গীয় আইন পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে তখন সমস্যার সমাধান না হয়ে সমস্যা আরো গভীর হয়েছে। একদল আইন পরিবর্তনের পক্ষে অন্যদল বিপক্ষে অবস্হান নেয়ার কারণে সমাজে বিশৃংখলা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একদল আস্তিক এবং আর একদল নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। আসল কথা হল মানুষ স্বর্গীয় আইন পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ স্বর্গীয় আইন প্রণেতা হলেন সৃষ্টিকর্তা নিজেই। সৃষ্টিকর্তার আইন তাঁর কোন সৃষ্ট জীব পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে না। স্বর্গীয় আইন পরিবর্তন করেন স্বয়ং ভগবান নিজে তাঁর অবতারের মাধ্যমে। যেহেতু বার বার স্বর্গীয় আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে সে কারণেই সৃষ্টিকর্তা বার বার তার অবতারকে পাঠিযেছেন আমাদের এই ধরাধামে। এজন্যই যখনই পৃথিবীতে অসত্য আর মন্দের উত্থান ঘটেছে, মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভূলে বিপথে গমন করেছে ঠিক তখনই সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্ট প্রিয় মানুষ জাতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই পৃথিবীতে তাঁর অবতারকে পাঠিয়েছেন। আর যখন নুতন কোন অবতার আমাদের রক্ষা করার জন্য নুতন শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তখনই আমরা তাকে অস্বীকার করেছি এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করেছি। আমাদের নিজের অজ্ঞতা এবং মূর্খতার জন্য। তাই বলে সৃষ্টিকর্তা তার এই কর্ম থেকে কোনদিনই বিরত হন নাই বা বিরত হবেন না। কারণ তিনি আমাদের অনেক বেশী ভালবাসেন। যার তুলনা করার মত কোন বস্তু আমাদের এই পৃথিবীতে নাই।

<u>ধর্মের দুইটি দিকঃ</u>

প্রত্যেক ধর্মের দুইটি দিক আছে। একটি হলো আধ্যাত্মিক এবং অন্যটি হলো জাগতিক বা সামাজিক। আধ্যাত্মিক দিকে পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধমের্র নিয়ম কানুন একই রকম। আর জাগতিক দিকে কোন ধর্মের সাথে অন্য কোন ধর্মের মিল নেই। যেহেতু জগৎ পরিবর্তনশীল এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম একসাথে আসে নাই তাই জাগতিক দিকের এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের কোন মিল নাই। আর এই মিল না থাকার কারণেই পৃথিবীতে যত মারামারি, গন্ডগোল আর অশান্তির ব্যাপক বিস্তার।

আমরা সবাই ভাবি আমার ধর্মই বড় এবং সঠিক আর বাকী সকল ধর্মই মিথ্যা। স্বর্গে গেলে শুধু আমরাই যাবো, আর কোন ধর্মের লোক নয়।
শুধুমাত্র আমরাই আছি সঠিক পথে, আর সবাই ভুল পথে আছে। ফলে যার যার মতো সবাই সঠিক পথ বাস্তবায়নে সচেষ্ট। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ অবাস্তব কিছু নয়। কিন্তু আমরা একবারও ভাবিনা যে, সকল ধর্মের উৎস সেই একই ভগবানের কাছ থেকেই। শুধু সময়ের বিবর্তনে যে জগতের বিবর্তন হয়েছে, নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন হয়েছে সেটাকে আমরা বিশ্বাস করিনা। মূলতঃ পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মের উৎস এক, লক্ষ্য একটাই।

তাহলে আমরা কেন বিবাদ করি?
বিবাদের মূল কারণ সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যদিও বিশ্বাস করি যে, পৃথিবী পরিবর্তনশীল কিন্তু ধর্মীয় জীবনে করি না। সে কারনে যখন নতুন অবতার এসে নতুন বাণী প্রচার করেন তখন আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করি। সমস্যাটা ওখান থেকেই শুরু হয়। আমরা কোন সময়ই নুতন অবতারকে স্বীকার করি না। কিন্তু তিনি অমাদের রক্ষারজন্য সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বহন করে আনেন।

এখান একটি ছোট্র উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে বলে মনে করি। মনে করুন এখন একটি শিশুর জন্ম হল, তার প্রিয় খাদ্য কি?
তার প্রিয় খাদ্য হলো তার মাতৃদুগ্ধ। এই শিশুটির একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তার মাতৃদুগ্ধেই শরীরের পুষ্ঠি সাধিত হবে। আস্তে আস্তে শিশুটির শরীরের বিকাশ ঘটতে থাকবে। ছয় থেকে নয়মাস বয়সে শিশুটি তার মাতৃদুগ্ধের সাথে সাথে অন্যান্য খাবার খেতে শিখবে। তার পরে যখন সে আরও বড় হবে তখন পুরোপুরি অন্যান্য খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।
সেই শিশু যখন একদিন বড় হবে তখন সে তার জন্য সবচাইতে প্রিয় মাতৃদুগ্ধ আর পান করবেন না। তখন তার প্রিয় খাদ্য কি হবে?
অবশ্যই ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, ডিম নানা ধরনের উন্নাতমানর খাবার।
যে শিশুটির জন্মের পর তার প্রিয় খাদ্য ছিল মাতৃদুগ্ধ, সেই একই শিশুর মাত্র কয়েক বছর পরে তার প্রিয় খাদ্য হচ্ছে অন্য জিনিষ।
যদি শিশুটির জন্মের পর পরই তাকে ভাত, মাছ,মাংস, ডিম ইত্যাদি ভাল খাবার দেয়া যেত তাহলে সে নিশ্চই খেতে পারত না।পক্ষান্তরে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে শিশুটির প্রাণত্যাগ হত। সেই একই শিশু এক সময়ে তার কাছে যে খাবার ছিল খুবই খারাপ সেই খাবারই তার কাছে সবচাইতে প্রিয় হয়ে যায়। আর এক সময় যে খাবার সবচাইতে ভাল ছিল সেটা তার কাছে খারাপ হয়ে যায়।
সেই শিশু যদি বড় হয়ে তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করে তাহলে কি তার বেঁচে থাকা সম্ভব? অথবা শিশু অবস্থায় যদি তাকে প্রাপ্ত বয়স্কের খাবার দেওয়া হতো তাহলে সেকি তা খেতে পারতো? বা জোর করে খাওয়াতাম তাহলে কি হতো? শিশুটির নিশ্চিত মৃত্যু।

আবার বলা যায়, আদিম যুগে মানুষ কাপড়- চোপড় পরতনা। কেউ যদি বলে আমি আদিম যুগে ফিরে যাবো তাহলে তাকে আমরা সবাই কি বলবো? কাপড় না পরে পাহাড়ে বাস করলে তাকে কি কেউ সুস্থ মানুষ বলে ভাববে? সুতরাং এখানে পরিস্কার যে, জাগতিক উন্নতির সাথে সাথে ধর্মের জাগতিক নিয়মেরও পরিবর্তন হয়।

এখানে আরও একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে বলে মনে করি। আমরা প্রতিদিন সকাল বেলা সূর্য্য উঠার পর তা ধীরে ধীরে দুপুর বেলা মধ্য আকাশে যেতে দেখি এবং এর পর থেকে আস্তে আস্তে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যেতে দেখি। এক সময় আসে যখন সূর্য্য অস্ত যায়। যেহেতু পৃথিবীর বুক থেকে সূর্য্য অস্ত হয়ে গেছে তাই পৃথিবীর সব কিছুই অন্ধকারে ছেঁয়ে যায়। সেটা এমন অন্ধকার যে, পৃথিবীর কোন আলোই সেই অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারে না। আস্তে ব আস্তে সময় পার হতে থাকে। অপেক্ষার প্রহর শেষে রাত্রি শেষ হয় তখন সৌন্দর্যমন্ডিত জ্যোর্তিময় সূর্য্য উদিত হয়। ঠিক একই রকম পদ্ধতি অবতারগণের আগমনের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

ঠিক একইভাবে যখন সত্যের সূর্য্য উঠে, তখন এক জ্যোতির্ময় নুতন দিনের আগমন ঘটে। চারিদিকের পরিবেশ আলোকিত হয়ে উঠে। ঘোর অন্ধকার কেটে যাবার ফলে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে। একটি নুতন দিনের আবির্ভাব হয়, সেই দিনের বয়স আবার বাড়তে থাকে। এক সময় আসে নবাগত এই নুতন দিনটিও চলে যায়। ধর্মের বেলাতেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। একটি নুতন ধর্ম নুতন সভ্যতার আলো নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আস্তে আস্তে তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠত হয়। এক সময় আসে তার দুঃসময়। অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যায়। মানুষের তৈরী কতকগুলো লৌকিক শিক্ষার দ্বারা সেই শ্বাত্বত ধর্মের আইন কানুন ঢাকা পড়ে যায়। ঈশ্বরের শিক্ষাকেও মানুষ ভূলে যেতে থাকে, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢেঁকে যায়। মানুষ তখন নিজের তৈরী শিক্ষাকর প্রচার করতে থাকে এবং ধর্মকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। তখনই বুঝতে হবে যে, পৃথিবী অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে গেছে। সূর্য্য ডুবে গেলে মানুষ যেমন রাতের অন্ধকারে মাটির কুপি জ্বালিয়ে অন্ধকারকে আলোকিতকরে তেমনি জীবনের অন্ধকার রাত্রিতে আমরা কিছু কিছু মহাপুরুষের আলোকের দেখা পাই। তাঁরা ঐ মাটির কুপির মতই আমাদের জীবন আলো দেন। একসময় আসে কুপিগুলোও নিভে যায় পৃথিবী পুনরায় গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায়।ঐ সময় আবার সত্যের সেই সূর্য্য উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অতীতে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখষ্ট, হযরত মুহম্মদ সকলের ভিতরেই সেই সূর্য্য উদিত হয়েছিল।

প্রত্যেক ধর্মের সামাজিক নিয়ম যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। এর অন্যতম কারন হলো মানব সমাজ নিজেই অবিরত ভাবে বিবর্তনের চাকায় ঘুরছে। ধর্মের সামাজিক নিয়ম-কানুনও এই সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে। সনাতন ধর্মের সামাজিক শিক্ষা দুইটি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে একটি হলো জাতি বা বর্ণ প্রথা, যা কঠোর ভাবে প্রত্যেকের জন্য পালনীয়। আর এই অধিকার একজন হিন্দু জন্মগত ভাবে লাভ করে। অন্যটি হলো 'অশর্মা' প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের স্তর।

এমনকি সনাতন ধর্মেও সময়ের সাথে সাথে নিয়ম পরিবর্তিত হচ্ছে। সনাতন ধর্মের এমন কিছু প্রথা ছিল যা এক কালে সবাই পালন করতো। কিন্তু বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। যেমনঃ সতীদাহ প্রথা। এই প্রথা এককালে যা ছিল অবশ্যই পালণীয়। স্বামীর সংগে জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত। বেচারী স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। বর্তমান যুগের হিন্দু ধর্মালম্বীরা এই নিয়মটাকে কাল্পনিক বলে মনে করবেন। মনে হবে এটা একটা রূপকথার গল্প। কিন্তু সেটাই ছিল বাস্তব এবং সত্য। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ঐ সতীদাহ প্রথা এখন গল্পে ঠাঁই নিয়েছে। এমনকি বর্ণ প্রথাও যা এক সময় কঠোর ভাবে পালন করা হতো, কিন্তু এখন বর্ণ প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে।

এই সকল প্রথা এক সময় সমাজের উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু সমাজ সব সময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই এক সময় সমাজের জন্য যা ছিল লাভজনক তা অন্য সময় সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আজকে আমরা যদি দেখি যে, ভারতে কি হচ্ছে? বর্ণপ্রথা যা এক সময় ছিল সমাজের উন্নতির প্রধান উপাদান, তাই এখন ভারতের উন্নতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক হিন্দু চিন্তাবিদ এই বিষয়ে একমত পোষন করেন।

রাধাকৃষ্ণানঃ- বর্ণপ্রথা অত্যাচার করার একটি অপজাত অস্ত্র এবং গোঁড়ামী মাত্র। তাই এটাকে চিরস্থায়ী রূপে বিলুপ্ত করার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ। শ্রেণী বৈষম্য আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ যাতে হতভাগাদের তারা উদ্দেশ্য সফল করতে না পারে। (The Hindu View of Life. p-93)

মহাত্মা গান্ধীঃ- ধর্মের সাথে বর্ণ প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। এটা আধ্যাত্মিক এবং জাতীয় উন্নতির অন্তরায়।

স্বামী বিবেকানন্দঃ- বর্ণপ্রথার ধারণা সবচাইতে বড় বিভক্তির কারন.....। সকল বর্ণ, হোক না তা জন্মগত। এটা হল মানব চিন্তার বন্দীদশা ।

রামকৃষ্ণ ঃ-বর্ণ প্রথা একটি ভাবে দূর করা যায়, আর তা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা। কেননা ঈশ্বরের প্রেমিকের কোন বর্ণ নাই। (Gospel of Ramkrishna-p-85-6)

হিন্দু শাস্ত্রে ধর্মের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করা হয়েছে। মনু সৃষ্টিতে আমরা একটি ভিন্ন ধর্মের সন্ধান পাই। একটা আলাদা জীবন পদ্ধতি দেখতে পাই, যা বিভিন্ন যুগের জন্য প্রযোজ্য।

''এক বিধান সত্যযুগের জন্য প্রযোজ্য, অন্য বিধান ত্রেতা যুগের জন্য এবং দাপর যুগের জন্য একটি এবং এখন কলিযুগের জন্য আরেকটি বিধান প্রযোজ্য। (Laws of Monu-1: 85)

বাহা'ই ধর্ম হল বর্তমান যুগের ধর্ম। এই ধর্মের শিক্ষা উন্নতির পথে সকল অন্তরায়কে অপসারণ করে। সমাজের মধ্যে একতা এনে দেয়।

আমেরিকাতে জাতিগত প্রথা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ভারতে এমনি বড় সমস্যা হল জাতিগত সমস্যা যা সমাজকে বিভক্ত করেছে। বাহা'ই ধর্মের নিয়ম হল সকল জাতিপ্রথা, শ্রেণীপ্রথা, বর্ণবৈষম্য দূরে ঠেলে সমাজকে একত্রিত করে এর উন্নতি সাধন করা। মানব জাতিকে একতাবদ্ধ করা শুধুমাত্র একটি মূলনীতি নয় বরং এটি হল গভীর আধ্যাত্মিক সত্য। যা ছাড়া সত্যিকারের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়।

এই বিষয়ে মহান বাহা'উল্লাহ্ মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ'' হে মানব সন্তান! তোমরা কি জানো, কেন আমরা তোমাদিগকে একই মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছি? ইহা এই জন্য যেন একে অপরের উপর অহংকার করিতে না পারো এবং যেন তোমরা প্রতিদিনই তোমাদের নিজেদের সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে পারো। যেহেতু আমরা তোমাদিগকে একই পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদের উচিৎ যেন তোমরা সকলে এক আত্মা হও। যেহেতু তোমরা একই পদসঞ্চারে ভ্রমন কর এবং একই মুখে আহার কর, একই দেশে অবস্থান কর, তোমাদের কার্য্যকলাপ হইতে ও কার্যসমূহ হইতে একত্বের লক্ষণসমূহ ও ত্যাগের সারাংশ প্রকাশমাণ হইতে পারে। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। হে আলোকের জনমন্ডলি! অতএব যত্ন সহকারে এই উপদেশ গ্রহণ কর। যেন তোমরা অত্যাশ্চার্য্য শক্তিশালী প্রভাবৃক্ষ হইতে পবিত্রতার ফলসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারো।"

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একতা আনার জন্যে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। ভগবান বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন যে,''মানুষ এখন অনেক উন্নতি করেছে। তাই এক সময় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে পন্থা উত্তম ছিল তা এখন আর নেই।'' পূর্বে একজন মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চাইলে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে সন্যাস বৃত্তি গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই প্রচুর পরিমানে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জন্য জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে। এখন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানুষের সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই। দরকার সমাজ থেকে বিচ্যুত না হয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা। মানুষ তার নিজের কাজ করেও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। এটা আরও একটি ঘটনা যে, পৃথিবীতে সব সময়ই পরিবর্তন ঘটেছে। আর এর সাথে সাথে ধর্মেরও পরিবর্তন দরকার যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অনেক হিন্দু চিন্তাবিদ আধুনিক পৃথিবীর সত্যকে মেনে নিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী

বলেছেনঃ'' বর্ণশংকরের নীতি আজকে আর প্রয়োজন নাই।" (Selection from Gandhi. p-265).

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ'' সামাজিক নিয়ম এবং প্রথা পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর পরেও পরিবর্তন হতে থাকবে।" (The Complete Works of Swami Vivekananda-Vol-6. p-184)

আমরা এতোক্ষণ ধর্মের সামাজিক বা জাগতিক দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন একটু আধ্যাত্মিক দিকে নজর দিই। আধ্যাত্মিক দিকে কোন ধর্মের সাথে অন্য কোন ধর্মের কোন বিভেদ নাই। যেমনঃ কোন ধর্মে নেই যে, চুরি করা, মিথ্যা বলা, মারামারি করা বৈধ। কোন ধর্মই কোন অবৈধ কাজের অনুমতি দেয়না। যা সৃষ্টির শুরুতে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অংশের কোন পরিবর্তন নেই। ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ সকল মানুষের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। বাহা'ই এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা নিচে দুই একটি বিষয়ে মিল খোঁজার চেষ্টা করবো।

সত্যবাদিতা সম্পর্কে

সনাতন ধর্ম	বাহা'ই ধর্ম
১ সত্য একাই বিজয় আনতে সক্ষম। ঐশ্বরিক পথ হলো সত্যবাদিতা। -মোন্দাকা উপনিষদ ৩ঃ১৬	১ হে মনুষ্যগণ! সত্যবাদিতার অলংকারে তোমার আত্মা সজ্জিত কর। -ভগবান বাহা'উল্লাহ্
২ মানুষ যখন ভাল সত্যকথা বলে, তখন সে সবচাইতে সত্য কথা বলে। -ঋক বেদ	২ সত্যবাদিতা হল এই পৃথিবীর সকল কিছুর ভিত্তি। -ভগবান বাহা'উল্লাহ্
৩ এই পৃথিবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।-ঋক বেদ	

ধর্ম সম্পর্কে

সনাতন ধর্ম	বাহা'ই ধর্ম
১ শ্রদ্ধার জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিই ধার্মিক। -গীতা, ৪ঃ৩৯	১ ধর্ম মানে সচেতন জ্ঞান এবং দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের বৈশিষ্টের অনুসরণ করা।

আনন্দ সম্পর্কে

সনাতন ধর্ম	বাহা'ই ধর্ম
১ আনন্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তার জন্য সে জীবিত, সজীব। যদি আনন্দ না থাকত তবে বিশ্ব সৃষ্টি হতো না।	১ সকল প্রকার দুঃখ আসে জাগতিক মোহ থেকে। আধ্যাত্মিক জগৎ হলো আনন্দের জগৎ -ভগবান বাহা'উল্লাহ্

প্রেম সম্পর্কে

সনাতন ধর্ম	বাহা'ই ধর্ম
১ শুধুমাত্র প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ আমাকে দেখতে পারে এবং আমাকে জানতে পারে এবং আমার কাছে আসতে পারে। -গীতা, ১১ঃ৫৪	১ আমাকে ভালবাস যেন আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারি, যদি তুমি আমাতে প্রেম না কর তবে আমার প্রেম তোমার কাছে কোন মতেই পৌঁছিবে না। -বাহা'উল্লাহ্

জাগতিক মোহে আসক্তি

সনাতন ধর্ম	বাহা'ই ধর্ম
১ সৃষ্টিকর্তা যা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ভোগ কর এবং অন্যের সম্পদে যেন তোমার আসক্তি না আসে।	১ যে সমস্ড় জিনিস তোমার অধিকারে আছে তা নিয়ে তোমরা আনন্দিত হইয়োনা, আজ রাতে যেগুলি তোমার অধিকারে আছে, আগামীকাল

-উপনিষদ

অন্যেরা সেইগুলির অধিকারী হবে।

-বাহা'উল্লাহ্

ধর্ম কিসের জন্যঃ

যদি আমরা বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, যখন কোন জনপদ পাপাচারে লিপ্ত হয়, অন্যায় ও কু-কর্মে মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রিয় মানুষকে যুগে যুগে সৎ পথ দেখানোর জন্য অবতার প্রেরণ করেছেন। অবতার এসে সেই সকল বিশৃঙ্খল মানুষকে ভাল পথে আনেন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল মানবজাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মের আরও অনেক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তবে সেগুলি হলো শান্তির পথে কাজ করার জন্যে। ধর্মের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য শান্তির স্বপক্ষের শক্তিকে প্রভাবিত করা। আমরা দেখি যে, সনাতন ধর্মের বন্ধুরা একদিন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করবে এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাসের যুক্তি সঙ্গত কারণও আছে। তারা অধির অপেক্ষায় আছে কখন আসবে সেই সদিন যেদিন সমস্ত পৃথিবীর লোক সনাতন ধর্মের পতাকা তলে সমবেত হবে। কিন্তু বাস্তবসত্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের এ বিষয়ে আরও জানা প্রয়োজন। আমাদের দেখতে হবে এরকমভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মে কি আছে। তারাও কি সনাতন ধর্মের বন্ধুদের মত অপেক্ষা করছে? আমরা যদি এবিয়ে বিষদভাবে খোঁজ নেই তাহলে দেখতে পাব যে, শুধু সনাতন ধর্মেই এই কথা নেই, ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদি সকল ধর্মেই আছে যে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একদিন এক হবে। মুসলিমগণ মনে করেন যে একদিন আসবে যেদিন সমস্ত পৃথিবীর লোক মুসলমান হবে, খ্রিষ্টানগণ মনে করেন যে খ্রিষ্টান হবে, ইহুদিগণ মনে করেন সকলে ইহুদি হবে। বন্ধুরা, তাহলে কি পৃথিবীর সকল মানুষ একেক বার করে একেক ধর্ম গ্রহণ করবে? নাকি এমন কোন সার্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হবে যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? সমস্যার শুরু এখানেই। আমরা ভাবি যে, হ্যাঁ, অবতার আসবে কিন্তু অবতার এসে আমরা যে ধর্মে আছি সেটাই কিছুটা ঠিকঠাক করে প্রচার করবে। বন্ধুরা এই অনুধাবনটি হল সববচাইতে বড় ভূল। কারণ পৃথিবীতে কোন দিনই আমাদের আশা করার মত বা ধারণা করার মত ঘটনা ঘটে নাই। পৃথিবীতে যখনই কোন অবতার এসেছেন, যে জায়গাতেই এসেছেন তারা কিন্তু একটি নুতন সার্বজনীন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। যা আমাদের চিন্তা এবং অপেক্ষার সংগে মেলে না। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই এসেছে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে। একেক যুগের প্রয়েজন অনুযায়ী একেক রকম। সেখানে যদি আমরা আমার মত করে চিন্তা করি তাহলে চিন্তা এবং বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান হবে বিস্তর।

আমাদের চিন্তার সংগে সংগতি রেখেও যদি কোন অবতার আসে তাহলে কি হবে আমরাএকটু আলোচনা করে দেখি। আমরা মনে করি যে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে পৃথিবীতে শান্তি আসা সম্ভব কিনা? যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সনাতন ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে কি পৃথিবীতে শান্তি আসবে?

শান্তি আসার পূর্বে আমরা দেখি যে, শান্তি আসার জন্য যে জিনিসটার সবচাইতে বেশী প্রয়োজন সেই জিনিসটা কি?

যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অত্যন্ত ধনী হয়ে যায়, যদি পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন অভাব না থাকে, যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হয়ে যায় তাহলে কি শান্তি আসবে? অবশ্যই না। কারন শান্তির মূল উপাদন সম্পদ, লেখাপড়া, জাগতিক সুখনয়। শান্তির মূল উপাদান হল একতা। কোন সমাজে যদি একতা না থাকে তাহলে শান্তি আসতে পারে না। কোন ক্রমেই না। ব্যপারটি এরকম যে, ধরুন আপনি ভাত রান্না করতে চান, আপনার খড়ি, পাতিল, পানি, চুলা,আগুন সবই আছে কিন্তু চাউল নাই। চাউল ছাড়া কি আপনি ভাত রান্না করতে পারবেন? নিশ্চয় না। হ্যাঁ আপনি মনের সান্তনার জন্য চুলা জ্বালিয়ে তার উপরে পাতিল দিয়ে সেইপাতিলে পানি দিয়ে জ্বালদিতেই থাকেন জ্বাল দিতেই থাকেন কিন্তু ভাত আর আপনার খাওয়া হবে না। কারণ চাল না থাকলে ভাত আসবে কি করে। ঠিক শান্তিও ঐ রকম। আপনি

টাকা , পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, শিক্ষা দিক্ষা সব দিয়ে চেষ্টা করুন শান্তি পাবেন না। কারণ একতা ছাড়া শান্তি আসতে পারেনা।

এখন দেখি বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান ধর্মগুলির মধ্যে একতা আছে কিনা। ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের মতো সনাতন ধর্মের ভিতরেও কোন একতা নাই। সনাতন ধর্ম ১০০-র বেশী ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটা ভাগ বলে আমি সঠিক পথে আছি, আর সবাই ভুল পথে আছে। যদি স্বর্গে যাই শুধু আমরাই যাবো। আর সবাই নরকে যাবে। প্রত্যেক ভাগ একে অপরকে শ্রদ্ধা করে না। পরস্পর বিরোধে লিপ্ত থাকে। এক ভাগ আরেক ভাগের চেয়ে বড় বা উচ্চতর শ্রেণী বলে দাবী করে এবং অন্যান্য ভাগকে ঘৃণা করে। অর্থ্যাৎ বিদ্যমান সনাতন ধর্মের অনুসারীদর মধ্যেই একতা নাই। তারা নিজেরাই আত্ম কলহে লিপ্ত। তার উপরে যদি সমস্ত পৃথিবীর লোকজন এই ধর্মের পতাকাতলে সমেবেতন হয় তাহলে পরিস্হিতি উন্নতির চেয়ে অবনতি হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?

তাহলে যেখানে একতা নাই সেখানে শান্তি আসবে কি করে? বর্তমানে যে পরিমান সনাতন ধর্মাবলম্বী আছেন তাদের মধ্যেই একতা নাই, তাহলে যদি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে আরোও বড় ধরনের অশান্তি দেখা দেবে। তখন ধর্মের কারণে যে শান্তি আসে সে কথা ভুলে মানুষ বলবে যে ধর্ম আসে অশান্তির জন্য।

তাহলে আমাদের কাছে পরিস্কার যে যদি কোন কোন অবতার আসেন তাহলে তিনি আমাদের কল্পনা অনুযায়ী আসেন না। কারণ সৃষ্টিকর্তা জানেন যে, আমরা যে যুগে বাসকরি সেই যুগের প্রয়োজন কি? কারণ সৃষ্টিকর্তা সবজান্তা। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব কিছু সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাই তিনি যখন কোন অবতার পাঠান, সেই অতবতার যে যুগে আসেন সেই যুগের উপযোগী নিয়ম কানুন সহ ধর্ম নিয়ে আসেন। যাতে করে তা দ্বারা সমস্ত মানবজাতি শান্তি লাভ করতে পারে। যদি তাঁরা পুরাতন জিনিসই আবার নিয়ে আসবেন তাহলে অবতার আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারন পুরাতন জিনিস আমাদের কাছে আছেই। অশান্তিকে বড় করা ধর্মের কাজ নয়, অশান্তিকে দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই অবতারের কাজ।

<u>অবতারের প্রয়োজন কেন ঃ</u>

শ্রীমদ্ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭,৮ ও ৯ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিস্কার করে বলেছেন যেঃ

''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রনায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ।
তাক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মমেতি সোহর্জুন।"

অর্থাৎ- পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করি।

যে ব্যক্তি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্মের কথা জানেন সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাহার আর পূনঃর্জন্ম হয়না।

গীতার উপরোক্ত শ্লোকটি হতে পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে, যুগে যুগে অবতারগণ এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন।

গীতার ঐ শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায়। তখনই অবতার পৃথিবীতে চলে আসেন। অবতার কোথায় আসবেন, কার কাছে আসবেন, কোন ভাষাতে আসবেন, আপনার আমার পছদন্দমত না হলে তিনি অবতার নন এ ধরনের ধারনার বাইরে আমাদের সৃষ্টিকর্তা। কারণ সৃষ্টিকর্তা হলেন সবচাইতে ক্ষমতাশালী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।গীতার এই শ্লোকে উল্লেখ নাই যে, এখানে বিশ্বের কোন স্থানে অবতার আসবেন। সমস্ত বিশ্বের কথা বলা হয়েছে। তিনি পৃথিবীর যে কোন স্হানে, যে কোন দেশে, যে কোন অঞ্চলে আসতে পারেন। অর্থাৎ পৃথিবী বা বিশ্বে যখনই ধর্মের গ্লানি হয়।তখনই তিনিমানব জাতিকে রক্ষা করতে আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন। গীতার এই শ্লোকে 'যখন' শব্দের সাথে একটি 'ই' প্রত্যয় যুক্ত করে 'যখন'টাকে আরোও শক্তিশালী করা হয়েছে। ধর্মের গ্লানি মানে যখন মানুষ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।মানুষ শাস্ত্র অনুযায়ী ধর্ম পালন করে না। পাপ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মানুষ যখন খারাপ কাজে মত্ত হয়ে পড়ে। তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। এখানে 'তখন' শব্দের সাথে একটি 'ই' প্রত্যয় যুক্ত করে 'তখন' কে শক্তিশালী করা হয়েছে। শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই মানে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। কারণ সৃষ্টিকর্তা কোনদিনই সরাসরি আমাদের মাঝে আসেন না। তাহলে এখন এর পরিস্কার অর্থ দাঁড়ায় যে, বিশ্বে যখনই মানুষ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং পাপ কাজে বা খারাপ কাজে মত্ত হয়ে পড়ে তখনই ভগবান অবতার রূপে আমাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পড়েন।

এখানে দুইটি শব্দ আছে 'যখনই' এবং 'তখনই'। এই 'যখনই' এবং 'তখনই' মানে কি? মানে হল কোন বিলম্ব নয়। যে সময় পৃথিবীতে এই সমস্যা দেখা দেবে ভগবান তখনই পৃথিবীতে আগমন করবেন। কোন বিলম্ব করবেন না।

কিন্তু আমরা মনে করি, না, এখনো আসার সময় হয় নাই। তাদের সময় কোন দিন হবেও না। কারণ তারা গীতার কথা পড়ে কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করেনা। বন্ধুগণ এখন মুক্তমনে চিন্তা করে দেখুন পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি হয়েছে কি না?। পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? যদি ধর্মের গ্লানি হয়ে থাকে এবং যদি পাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকেল তাহলে গীতার কথা কখনো অসত্য নয়। অবতার অবশ্যই এসেছেন।

আট নম্বর শ্লোকে দেখা যায় যে, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ। অর্থাৎ অবতার শুধু একবার আসবেন না। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আসবেন, প্রয়োজন হলেই তিনি আসবেন। তিনি এসে সে সময় যারা ভাল লোক থাকবেন তাদের পরিত্রাণ করবেন। অর্থ্যাৎ তাদেরয বাঁচাবেন। রক্ষা করবেন। পাপীদের বিনাশ অর্থাৎ যারা পাপী আছে তাদের ধ্বংস করবেন। খারাপ লোক যারা আছে তাদের ধ্বংস করবেন। এবং ধর্ম সংস্থাপন করবেন।

ধর্ম মানে আমরা সবাই বুঝি। ধৃ- ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। যে মানুষ যেটা ধারণ করে সেটাই তার ধর্ম। ধর্ম শব্দ ছাড়াও এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে, সেটা হচ্ছে 'সংস্থাপন'। সংস্থাপন মানে কি? সংস্থাপন মানে প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা মানে কি? প্রতিষ্ঠা মানে নতুন করে কোন জিনিস স্থাপন করা। যা পূর্বে ছিলনা এমন জিনিস প্রতিষ্ঠা করা। আপনার কি মনে হয় যে, প্রতিষ্ঠা মানে মেরামত করা? বা ঠিকঠাক করা, একটু খারাপ হয়ে গেছে তা ঘষামাজা করে পুনরায় চালু করা? না এ ধারনা মোটেই সঠিক নয়। কারণ সংস্হাপন মানে মেরামত,ঠিকঠাক, ঘষামাজা করা নয়। সংস্হাপন শব্দের অর্থ হল যে জিনিষ আমাদের কাছে নাই তা প্রতিষ্ঠা করা

অনেকেই আছেন যারা প্রতিষ্ঠা মানে মেরামত করার কথা ভাবেন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করেন যে, হ্যাঁ অবতার আসবে কিন্তু তা এই সনাতন ধর্মেরই যে সকল অংশ দুর্বল হয়ে গেছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা

মেরামত করবেন। কিন্তু বাস্তবে আসলে তা নয়। প্রতিষ্ঠা এবং মেরামত সম্পুর্ণ আলাদা জিনিস। আমরা জানি যখন অবতার আসেন তখন অবশ্যই নতুন কিছু নিয়ে আসেন এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষকে একতাবদ্ধ করেন। আর তখনই আমরা ভাবি যে, এইতো আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দিল। আসলে কেউ কোন ধর্মকে ধ্বংস করতে পারেনা। সবকিছু ভগবানের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। একটা কথা আমরা সব সময়ই ভূলে যাই যে, সকল অবতারগণ আসলে একই। তারা একই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমাদের জন্য আলো নিয়ে এসেছেন। তাদের দেখানো আলোতেই আমরা পথ চলি। সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আমরা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদেরকে আলাদা আদালা করে ভাবি। ধর্ম প্রগতিশীল। সৃষ্টির সেই আদি ধর্মকেই সকল অবতারগণ সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই প্রক্রিয়া প্রথম থেকেই বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমাদের চিন্তা চেতার সাথে মিল খেতেও পারে আবার নাও পারে।

তাহলে এখন আমাদের কাছে পরিস্কার যে, বিশ্বের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে গীতার বাণী অনুযায়ী অবতার অবশ্যই আসবেন।

নবম শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, যে ব্যক্তি আমার এই দিব্য জন্ম এবং কর্মের কথা জানেন। অর্থাৎ যিনি অবতারের আগমন এবং তাঁর ধর্মের কথা জানেন এবং তাকে অনুসরণ করেন সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে আমাকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যদি সেই যুগের অবতারকে চেনেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলেন তাহলে তিনি মৃত্যুর পরে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন। তার আর পুনঃর্জন্ম হয়না। এই পুনঃর্জন্ম না হওয়ার বিষয়টি হল একজন হিন্দুর বড় পাওয়া। কারণ প্রত্যেকটি হিন্দু পুনঃর্জন্ম ভয়ে ভীত। কিন্তু গীতাতে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে, যে তার যুগের অবতারকে চেনে এবং তাঁর কথা মতো চলে তাহলে সে মৃত্যুর পরে ভগবানকে পাবে। তার আর পুনঃর্জন্ম হবে না।

এখানে পরিস্কার যে, আপনি যে যুগে জন্মেছেন আপনাকে সেই যুগের অবতারকে চিনতে হবে এবং তাকে মানতে হবে। তাহলে আপনার আর পুনঃজন্ম হবে না। আর যদি আপনি সেই পুরোনো স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেন তাহলে আপনার পুনঃজন্ম কে ঠেকাবে?

দুঃখের বিষয় হল, বেশীর ভাগ মানুষই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। আর যারা অধ্যয়ন করেন তারাও তা বোঝার চেষ্টা করেন না। ফলে অন্ধকার পথে চলতে হয় এবং ৮৪ লক্ষ বার পুনঃর্জন্মের ভয় থেকেই যায়। যুগের অবতারকে চেনা মানুষ হিসাবে আমাদের প্রথম দ্বায়িত্ব। তাছাড়া আমরা ধীরে ধীরে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়বো। কুসংস্কারের জাল থেকে মুক্ত করে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসাই অবতারের কাজ।

ভবিষ্যতে অবতার কি আসবেনঃ

আমরা একটু আগেই পবিত্র গীতাতে দেখতে পেলাম যে, যুগে যুগে আরোও অবতার আসবেন। সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, সনাতন ধর্মেই মোট দশজন অবতার আছেন। তাঁদের মধ্যে মোট নয়জন ইতি মধ্যেই এসেছেন। পরে যিনি আসবেন তিনি আসবেন কলি যুগের শেষে। তিনি এসে নতুন জগৎ এবং নতুন ধর্মের সূচনা করবেন। তাঁর ধর্মের বিধান এক হাজার বছর কার্যকরী থাকবে এবং শান্তি ও উন্নতির দিকে চালিত হবে।

আমরা ইতিহাসে দেখি যে, যখন ন্যায়, ধর্ম প্রবণতা এবং সত্য ধর্ম শেষ হয়ে যায় তখন ঈশ্বর বিশেষ একজনকে পাঠান এবং এর প্রতিশ্রুতি সব সময়ই ছিল। যুগে যুগে অবতার এসেছেন এবং আসবেন। সনাতন ধর্মের মতে, এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচুর সংখ্যক অবতার আসেন এবং তাঁদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা যে যুগে বসবাস করছি তা হল একটি নতুন যুগ। এই যুগের অবতারের মহান দ্বায়িত্ব হল মানুষকে ভগবানের নিকটবর্তী করা। মানুষকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা। প্রত্যেক অবতারই একতার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মানুষ সেটাকে অনৈক্য এবং যুদ্ধের উৎসরূপে ব্যবহার করেছে।

প্রত্যেক ধর্মেরই মূল ভিত্তি এক। প্রত্যেক ধর্মই একটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য কিন্তু সব সময় একটাই, বহুবিধ নহে। সব সময়ই অবতারগণ মানুষের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। অবতারগণ সব সময়ই ধর্মীয় কুসংস্কারের মোকাবেলা করেছেন। যদি আমরা ঐ কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি এবং সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে আমরা সবাই এক হতে পারবো। প্রত্যেক অবতারই ছিলেন মানব জাতির পথ প্রদর্শক। আমরা কি এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারি? আমরা কি দীপ্তিময় আলোক বর্তিকা থেকে দূরে থাকবো?

কল্কি অবতার সম্পর্কে শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে কল্কি অবতার সম্পর্কে পরিস্কার ভাবে বর্ণণা করা আছে। কল্কি অবতারের নাম, কখন আসবেন, এটা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে জানা যায়। আমরা সাধারণত: জানি যে, কলি যুগের শেষে কল্কি অবতার আসবেন। তাহলে আমরা প্রথমে কলিকাল সম্পর্কে খোঁজ নিই। কলিকাল কোনটি? কি ভাবে বুঝবো যে এটা কলিকাল? আমরা জানি যে, প্রত্যেক জিনিসের একটা লক্ষণ আছে যেমন জ্বরের লক্ষণ হল শরীর গরম হবে। শীতের লক্ষণ হল শীত লাগবে। বসন্তের লক্ষণ হল ফুল ফুটবে এবং পাখি গান গাইবে। সেইরুপ কলিকালেরও কিছু লক্ষণ আছে।সেই সমস্ত লক্ষণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে কোনটি কলিকাল। প্রথমে আমরা দেখি যে শাস্ত্রে কলিকাল সম্পর্কে কি লেখা আছে।

শ্রীমদ্ভগবত এর প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যেঃ-

কলিযুগে বুদ্ধিহীন নরগণ যত।
অলস অল্পায়ু হবে পাপে সব রত ॥
ব্যাধি আদি বাধা বিঘ্ন হইবে প্রবল।
শাস্ত্রসার না বুঝিবে মানব সকল ॥
শাস্ত্রের লিখিত যত পূর্ণ কর্ম্মচয়।
করিতে অক্ষম হইবে নর সমূদয় ॥

এখানে যদি আমরা সরল ভাষায় দেখি তাহলে বোঝা যায় যে, কলিকালে পুরুষরা বুদ্ধিহীন হবে; আয়ু হবে কম; পাপে রত থাকবে; রোগ বালাই বেশী হবে; শাস্ত্রের বাণী মানুষ বুঝবে না; শাস্ত্রের বর্ণিত কর্ম সমস্ত পুরুষ পালন করতে অক্ষম হবে। এ কালের পুরুষরা তাদের মেধা ধর্ম শাস্ত্রে না লাগিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ রচনায় ব্যস্ত থাকবে। দিন দিন মানুষের আয়ু কমতে থাকবে। বিভিন্ন ধরনের অজানা রোগ এসে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধবে। মানুষ ধর্মের কথা শুনবে কিন্তু তাতে মনোনিবেষ করবে না এমন কি তারা সেটা তাদের জীবনে প্রয়োগ করবে না। শাস্ত্রের যে কঠিন নিয়ম আছে মানুষ সেটা মানতে অপারগ হবে। মানুষ সেটা মানতে চেষ্টা করবে কিন্তু পালন করতে সফলকাম হবে না।একবার খোলা মন নিয়ে ভেবে দেখুনতো, এই ঘটনাগুলো ঘটেছে নাকি?

এছাড়াও শ্রীমদ্ভগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিকালের পুরো বর্ননা পাওয়া যায়ঃ-

কলিতে হইবে ধন মানবের সার।
আর সব গুণ আদি যতেক আচার ॥
সকলি ধনের বশ হইবে নিশ্চয়।
আর শুন মহামতি কহি সমূদয় ॥

বড়ই অধর্ম্মী সবে হইবে তখন।
দাম্পত্য প্রণয়ে রুচি না হবে কখন ॥
ক্রয় বিক্রয়েতে সব প্রবঞ্চনা হবে।
স্ত্রী-পুরুষে রতি শ্রেষ্ঠ জানিবে তা সবে ॥
মহাপাপ কলিকালে হবে মহাশয়।
ব্রাহ্মণের কথা এবে জানিবে নিশ্চয় ॥

উক্ত অংশের সরলার্থ এরকমঃ- কলিকালে মানুষের প্রিয় বস্তু হবে ধন-সম্পদ; ধন-সম্পদ ছাড়া মানুষ কিছুই বুঝবেনা; যেখানেই যান দেখবেন সবাই সম্পাদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আছে। সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ, ন্যায় অন্যায় বোধ মানুষের মধ্যে লোপ পেয়ে যাবে। সবাই একই দিকে দৌড়াচ্ছে। কিভাবে সম্পদ অর্জন করব। মানুষ মনে করবে সম্পদ ছাড়া পৃথিবীতে কোন মান সম্পাদন নাই। তাই সকলেই এই দৌড়ে সমবেত হবে। এসময় মানুষ অধর্মী হবে; মানুষের ভিতরে মুখে ধর্মের কথা থাকবে কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের ধর্মের সংগে কোন সংশ্লেষ থাকবে না। স্বামী- স্ত্রী ছাড়াও অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হবে; নিজের স্ত্রী ছাড়াও এ সময়ের লোকজন অন্য নারীতে আসক্ত হবে।স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সুখের সংসার তাতে আগুন ধরাবে অন্য নারী। বেচা-কেনার সময় ঠকাবে; মানুষের বিকেক এতই লোপ পাবে যে, মানুষ বেচা এবং কেনার সময় উভয় খাতেই লাভের চিন্তা করবে। লাভ ছাড়া মানুষ এক পা ও আগে বাড়াবে না। মনে হবে জীবনের মানেই হল লাভ আর ক্ষতির হিসাব। বড় বড় পাপ এই কলিকালের মানুষ করবে।
এরপরে আমরা দেখি যে শাস্ত্রে আর কি কি আছেঃ-

সভাস্থলে বহু কথা কবে যেইজন।
পন্ডিত বলিয়া তারে করিবে গণন ॥
ধনহীন যেইজন কলিতে হইবে।
অসাধু বলিয়া তারে সকলে কহিবে ॥
দাম্ভিক হইবে আর যেবা অহংকারী।
সাধু বলি কলিতে সে উচ্চ নামধারী ॥
বাচালতা প্রকাশিত হবে যার মুখে।
সত্যবাদী হবে সেই থাকিবেক সুখে ॥

এই অংশে দেখা যায় যে, যে লোক সভার মধ্যে বড় বড় বক্তব্য দেবে কলিকালে সেই হবে পন্ডিত; তার ভিতরে জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক। হায়রে মানুষ এ ঘটনা আমরা আমাদের চারিদিকে অহরহই দেখতে পাই।কারা আজ সমাজের মধ্যে বড় বড় বক্তব্য দেয়। কাদের সম্মান আজ বেশী। সমাজে কারা আজ অসহায়? কলিকালে যার টাকা পয়সা থাকবে না সে যতো ভাল লোকই হোক না কেন সবার কাছেই সে খারাপ বলে বিবেচিত হবে। কোথায় ভাল লোকের মান সম্মান?। যার টাকা নাই, দুনিয়াতে তার কিছুই নাই। এ কথা সমাজে এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। কলিকালে যে সকল সাধু রাগী আর অহংকারী হবে তারাই সবচাইতে নাম করা সাধু হবে। ভন্ড, দাম্ভিক, সাধুরা আজ বড় বড় প্রতিপত্তির মালিক। আসল সাধুরা আজ সমাজে অসহায়। তাদের কোন স্হান নেই। যে লোক বেশী কথা বলবে সেই হবে সত্যবাদী এবং সে সুখে থাকবে। মিথ্যাবাদীরা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সত্যবাদীরা মিথ্যা না বলতে পারার কারণে পদে পদে ঠকে যাচ্ছে। মিথ্যাবাদি লোকেরা আজ সত্যাবাদীদে উপরে কর্তৃত্ব করে চলেছে।

এরপর আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই যেঃ-

এইরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সম্ভবে।
দুষ্ট প্রজাগণে সব পরিপূর্ণ হবে ॥

কলিকালে যতোসব নর পতিগণ।
লুব্ধক নির্দয়চিত্ত হবে সর্বক্ষণ ॥
দস্যুকার্য্যে সকলেতে উন্মত্ত হইবে।
প্রজার উপরে বহু পীড়ন করিবে ॥
দস্যুর সাদৃশ্য হবে যতো নরবর।
ধর্ম্মের উপদেশ দিবে যতেক পামর ॥

এখানে বলা হচ্ছে যে, এরকম পৃথিবীতে বিনা কারণে খারাপ লোকে দেশ পরিপূর্ণ হবে। জনগণের মধ্যে অধিকাংশব লোক অসৎ পম্হা অবলম্বন করবে। ভাল বিষয়গুলো শুধু ধর্মীয় শাস্ত্রে পাওয়া যাবে কিন্তু বাস্তবে সমাজের মানুষের ভিতরে তা অনুসরণ করার লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। দেশের রাজাগণ লোভী ও নির্দয় হবে। দেখুন, আজকে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা তথা সরকার। তারা কি করছে? তাদের উদ্দেশ্য কি? তাদের ব্রত ছিল জনগণের সেবা করা। কিন্তু বাস্তবে তারা কি করছে? সেবার বদলে তারা জনগণকে শোষণ করছে। তারা নিজের স্বার্থের জন্য প্রজার উপরে নানা ধরনের অত্যাচার করছে। দেশের প্রজারা কেমন আছে তা নিয়ে শাষনকর্তাদের কোন চিন্তা নাই। তারা সর্বদা নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। দেশের রাজারাদের যেখানে প্রজাদের সেবা করা দরকার তারা তা না করে প্রজাদের সংগে লুটেরাদের মত আচরণ করছে। মনে হচ্ছে তারা প্রজাদের সব কিছু ছিনিয়ে নেবে। রাজারা দক্ষের মতো আচরণ করবে। দেশের প্রজাদের অত্যাচার করবে। পাপিষ্ঠ লোক মানুষকে ধর্মের উপদেশ দেবে। কারা আজ ধর্মের আসনে বসে আছে। আর কাদের থাকার কথা? একটু খেয়া করলেই বুঝতে সক্ষম হবেন। কোন ভাল লোক, সাধু ব্যক্তি কি ধর্মের উচ্চস্হানে আছে?
শাস্ত্রে আরোও উল্লেখ আছে যেঃ-

আশ্রম হইবে সব গৃহের মতোন ।
স্নেহশূণ্য হবে সব মাতা-পিতাগণ ॥
পিতা-মাতা প্রতি পুত্র যত্ন না করিবে।
পত্নী-ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাহার হইবে ॥
গুনহীন হবে যতো ঔষধি সকলে।
বহুল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হবে মেঘদলে ॥
আর আর নরপতি যতো সম্প্রদায়।
মোহিত হইবে সবে কলির মায়ায় ॥

কলিকালে মাতা-পিতাগণ স্নেহশূণ্য হবে; সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা কমতে থাকবে। পুত্র পিতা-মাতার দেখাশোনা না করে শ্বশুর বাড়ীর লোকের সাথে বেশী সম্পর্ক স্থাপন করবে। দেখুন পতি ঘরে ঘরে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। আজ সমাজে প্রতি ঘরে ঘরে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে না দেখে সন্তান তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। যার ফলে আমাদের দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বৃদ্ধাশ্রম। নিজের ভাইবোনদের সংগে শত্রুর মত আচরণ করে তারা শ্বশুর বাড়ির লোকের সংগে বেশী সম্পর্ক রাখবে। আকাশে বেশী বিদ্যুৎ চমকাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকপ প্রকট আকারে দেখা দেবে। এভাবে সব ধর্মের মানুষ কলির মায়ায় মত্ত হয়ে যাবে।

এরপর শ্রীমদ্ভগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাই যে কলিকালের লক্ষণসমূহ সম্পর্কে আরোও বর্ননা করা হয়েছেঃ-

একালে অসতী সব হইবে রমণী।
দস্যুপূর্ণ নগরী যে শুন নর মনি ॥
কামেতে উন্মত্ত যতো ব্রাহ্মন হইবে।
অসন্তুষ্ট চিত্ত বহু ভোজন করিবে ॥
তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর।

লোভে পুরপূর্ণ হবে সন্যাসী অন্ড়র ॥
খর্বকায়া লজ্জাহীনা হবে নারীগণ।
বহু পুত্রবতী বহু করিবে ভোজন ॥
বণিকেরা ছলকারী হবে সর্বক্ষণ।
ক্রয় ও বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন ॥

এখান থেকে বোঝা যায় যে, কলিকালে মেয়েরা অসতী হবে; মেয়েদের চরিত্রগুন নষ্ট হয়ে যাবে। তারা তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। শহর হবে দস্যুপুর্ণ। অথ্যাৎ শহরে চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, মাদকাসক্তদের আড্ডাখানায় পরিণত হবে। ব্রাহ্মনগণ তাদের কাম সংবরণ করতে সক্ষম হবে না। তাদের অন্তর কামেতে উম্মত্ত থাকবে। সন্যাসীরা যারা নিজের সংসার, বিষয় আশয় সব ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু একালের সন্যাসীর অন্তর লোভে পরিপূর্ণ থাকবে; তাদের নজর থাকবে সব সময় সম্পদের উপর। মেয়েরা খাটো এবং লজ্জাহীন হবে; মেয়েরা ধীরে ধীরে আকারে ছোট হবে। মেয়েরা যে লজ্জাশীলা, তারা ধীরে ধীরে সেটা ভূলে যাবে। ব্যবসায়ীরা ছলনাকারী হবে এবং তারা কেনা-বেচা উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে ফাঁকি দেবে। সর্বক্ষেত্রে দেখবেন যে, ব্যবসায়ীরা আপনাকে কিভাবে ঠকাবে সেই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মানুষের কাছে মুল্য ঠিকই নেবে পক্ষান্তরে জিনিষ দেবে ওজনে কম অথবা খারাপ মানের জিনিষ।

শুদ্রগণ তপোবেশী সতত হইবে।
অধার্মিক জন ধর্ম আসনে বসিবে ॥
তাহারা কহিবে সদা ধর্মের কথন।
কলিকালে হবে সব এরূপ ঘটন ॥
পিশাচের ন্যায় সবে হইবে দর্শন।
বিবাহ করিবে সদা লয়ে তুচ্ছ ধন ॥
আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জন করিবে।
আত্মীয়-স্বজন নাশে প্রবৃত্ত হইবে ॥
বৃদ্ধ পিতা-মাতাগণে না করি পালন।
সর্বক্ষন আত্মসুখে হইবে মগন ॥

এখান থেকে বোঝা যায় যে, কলিকালে অধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের আসনে বসবে।ধার্মিক লোকের স্হান ধর্মীয় আসনে হবে না। যারা সমাজে ছলকারী, মিথ্যাবাদী, অসাধু, তারাই ধর্মের স্হানগুলো দখল করে বসে থাকবে। ধর্মীয় স্হান নিয়ে তারা ব্যবসা করবে।। এসকল অসাধু ব্যক্তিরাই আপনাকে ধর্মের উপদেশ দেবে। যেন আপনি ভাল পথে চলেন। পিছনে হীন উদ্দেশ্য থাকবে নিজের স্বার্থের। পিশাচের ন্যায় বিবাহের সময় যৌতুক নেবে। এটা কন্যার পিতা মাতার জন্য একটি জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দেখা বে। কারণ যৌতুক ছাড়া কন্যা দায় গ্রস্হ পিতা তার কন্যাকে বিবাহ দিতে সক্ষম হবেন না। মানুষ নিজের কাছে সবচাইতে মুল্যবান জিনিষ তার নিজের প্রাণ সেটা না রেখে আত্মহত্যা করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে মারামারি গন্ডগোল করবে। বৃদ্ধ বাবা-মাকে না দেখে নিজের সুখে মশগুল হয়ে থাকবে।
এইগুলি হল কলিকালের সংক্ষিপ্ত বর্নণা। এগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, কোনটা কলিকাল। এখন আপনি একটু কুসংস্কার মুক্ত, পরিস্কার মন নিয়ে ভাবুনতো এর মধ্যে কোন কাজটা ঘটেনাই? এমন কোন বিষয় আছে যা এখনো ঘটতে বাকী আছে? নিশ্চয়ই নাই? তাহলে আমরা দেখবো যে যদি এই সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহলে কি হবে, এই বিষয়ে শাস্ত্রে কি আছে?

এ বিষয়ে আমরা শ্রীমদ্ভগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৩ নং শ্লোক হইতে ৩৭ নং শ্লোকে দেখতে পাই যেঃ-

এইরূপে কলি শেষ হইবে যখন।
মানবে করিবে গর্ধবের আচরণ ॥
তখন ধর্মের ত্রাণ করিবার তরে।
সত্ত্বগুণে নারায়ন অবণী ভিতরে ॥
অবতার হবে পূণঃ দেব নারায়ন।
সাধুগণে পরিত্রাণ করিতে তখন ॥
ব্রাহ্মনের শিরোমনি বিষ্ণুযশা নাম।
সম্ভল নামেতে যথা মনোহর গ্রাম ॥
কল্কিরূপে অবতার হবে দয়াময়।
অষ্টশ্বর্য্য গুনান্বিত জানিবে নিশ্চয় ॥

এখানে আমরা পরিস্কার দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে যখন উপরিল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটবে তখনই কলিকাল। কলিকাল কিন্তু চিরস্হায়ী হবে না। এই নির্মম, অসত্য, ছলনাকারী, অমানবিক যুগেরও একদিন শেষ হবে। বর্ণিত ঘটনাগুলো ঘটতে থাকলে এক সময় আস্তে আস্তে কলির সময় শেষ হবে। তখন মানুষ গাধার মতো আচরণ করবে। মানুষের কোন বিচার বুদ্ধি থাকবে না। মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাবে। মানুষ মানুষেরশত্রু হবে। সে সময় ভো ভগবান চুপ করে বসে থাকবেন না। তিনি আমাদের খুবই ভালবাসেন তাই তিনি আমাদের এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করবেন। আমার আমাদের রক্ষা করার জন্যই তথা ধর্মকে বাঁচানোর জন্য ভগবান আবার পৃথিবীর মধ্যে অবতার হয়ে আসবেন তথা তিনি মানবজাতিকে রক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে অবতার পাঠাবেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবতার প্রেরণ করে সাধুদের বাঁচাবেন এবং পপীদের বিনাশ করবেন।তিনি যে নামে আসবেন সে তামও শাস্ত্রে পরিস্কার করে দেয়া আছে। তিনি কি নামে আসবেন? তিনি আসবেন ''বিষ্ণুযশা'' নামে। ইনি হবেন কল্কি অবতার।

আমরা জানিযে, কল্কি যুগে যে সকল ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার সব গুলোই সংঘটিত হয়ে গেছে। তাহলে ভগবৎ গীতার কথা অনুযায়ী, 'যখনই ধর্মের গ্লানী হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আমি শরীর ধারন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।' অর্থাৎ কোন বিলম্ব হয় না। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, কল্কি অবতারের আসার সময় আর বাকী নাই। তিনি অবশ্যই এসে গেছেন। যেহেতু কলিকালের লক্ষনগুলো সব দেখা গেছে তাই শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবানী অনুযায়ী কল্কি অবতার এসেছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের খোঁজ খবর নেয়া উচিৎ। এখন আমরা দেখি যে শাস্ত্রে যে ভবিষ্যৎ বাণী আছে তা যদি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে বৃথা সময় নষ্ট না করে আমরা বিষ্ণু যশাকে খুঁজি।

আমরা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে জেনেছি যে, কলিকালে একজন অবতার আসার কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে। কোথায় আছে, কিভাবে আছে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পূর্বের বিষদ আলেচনা থেকে জেনেছি যে, কল্কি অবতারের নাম হবে 'বিষ্ণুযশা'। কে এই বিষ্ণুযশা? এ বিষয়টি আরও পরিস্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা নিচে আলাপ করছি।
বিষ্ণুযশা একটি সংস্কৃত শব্দ। প্রথমে এটাকে আমরা বাংলা করি। বাংলা করে আমরা জেনে নেই যে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা অনুযায়ী বিষ্ণুযশা এর অর্থ কি? বিষ্ণুযশা শব্দটাকে প্রথমে আমরা সন্ধি বিচ্ছেদ করে নেই। বিষ্ণুযশা শব্দটাকে ভাংলে এরকম দাঁড়ায়-

বিষ্ণু + ঊষা = বিষ্ণুযশা।
বিষ্ণু শব্দের অর্থ হল= ঈশ্বর,
ঊষা শব্দের অর্থ হল = আলো।

অর্থাৎ বিষ্ণুযশা শব্দের অর্থ দাঁড়ায় "ঈশ্বরের আলো"। অর্থাৎ যিনি কল্কি অবতার হবেন তাঁর নামের বাংলা অর্থ হবে ''ঈশ্বরের আলো"। অন্য ভাষাতে এর অর্থ কি হবে আমরা দেখি, যেমন-ইংরেজীতে- Glory of God, পালি ভাষাতে- অমিতা বাহা, উর্দুতে- আল্লাহ কি রশ্নি।

আমারা আমাদের ভাষা জ্ঞান নিয়ে কোন সমময়ই চিন্তা করি না। আমরা কোন সময়ই ভাবিনা না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। একই জিনিষ হয়তো আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ভাষা না জানার কারণে অন্য কেউ যদি তার ভাষাতে সেই জিনিষের নাম আমাদের বলে তাহলে আমরা তা আর চিনতে পারি না। ভাষার জন্য আমরা অনেক জিনিষ সহজে বুঝতে পারিনা। একই জিনিস হয়তো আমাদের কাছেই আছে কিন্তু ভাষা জানা নাই দেখে আমরা সেই জিনিস চিনতে পারিনা। যেমন ধরুন জল। জলকে সাধারনতঃ আমরা কি কি নামে ডাকি।

১। পানি
২। Water
৩। আব
৪। বারি

একজন ইংরেজ যদি একজন বাঙ্গালীর কাছে আসে এবং বলে আমাকে Water দেন তো। আর সেই বাঙ্গালী যদি ইংরেজী ভাষার A,B,C,D, না জেনে থাকে তাহলে কিভাবে ঐ লোকটিকে ওয়াটার দেবে। পক্ষান্তরে ঐ ইরেজও যদি বাংলা শব্দ না জানে তাহলে সে কিভাবে জল চাইবে? এর অথ হল আমরা যদি ভাষা জানি তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টি খুবই সহজ হয়ে যায় আবার যদি না জানি তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। উপরে আমরা জলের কয়েকটি নাম বিভিন্ন ভাষাতে দেখিয়েছি। জলের আরোও অনেক নাম আছে। তাহলে কি একেকটি জল নামের ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। কোন দিনই হয় না। জিনিস একই থাকে, শুধু ভাষায় পার্থক্য হয়।

এখানে আরও একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে, যেমন ধরুন, একজন মুসলমানের নাম আব্দুল করিম এবং একজন হিন্দুর নাম হরি দাস। সরল ভাবে দেখলে দেখা যায় যে, একজন হিন্দু আর একজন মুসলিম।এর কারণ হল আমরা ছোট বেলা থেকে এভাবেই শিক্ষালাভ করে এসেছি। এখানে একটি নাম আছে আরবী ভাষায় এবং অন্য নামটি আছে ফারসী ভাষায়। নাম শুনে সহজেই,বোঝা যায় যে, এটা একজন মুসলমানের নাম এবং অন্যটা একজন হিন্দুর নাম। আমাদের কাছে এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে দুইজনের নামের অর্থ একই। যদি দুইটা নামকে আমরা বাংলা করি তাহলে পরিস্কার হয়ে যাবে। যেমন-

আবদুল + করিম = আব্দুল করিম।
আব্দুল শব্দের অর্থ হল = চাকর
করিম হল = ঈশ্বরের নাম
আব্দুল করিম = ঈশ্বরের চাকর।

হরি + দাস = হরিদাস
হরি হল ঈশ্বরের নাম = ঈশ্বর
দাসশব্দের অর্থ হল = চাকর
হরিদাস = ঈশ্বরের চাকর।

এখান থেকে পরিস্কার হয় যে, দুজনের নামের ক্ষেত্রে একটি আরবী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুইজনের একই নাম। নামের ভেদাভেদ শুধু ভাষাতে।

আশাকরি আমাদের ভাষার সমস্যা দূর হয়েছে। একটু আগে আমরা আলাপ করেছি যে, কল্কি অবতারের নামের বাংলা অর্থ হইলো ''ঈশ্বরের আলো।"

গীতা থেকে আমরা আগেই জেনেছি যে, অবতার আসার জন্য ভগবান দেরী করেন না। তাই কলি যুগের অবতার ১৮৪৪ সালেই আমাদের পৃথিবীতে এসে গেছেন। তাঁর নামা 'বাহা'উল্লাহ্'। বাহা'উল্লাহ্ নামটি আরবী ভাষায়। এখন আমরা দেখি যে বাহা'উল্লাহ্ নামের বাংলা অর্থ কি?

বাহা + উল্লাহ্ = বাহা'উল্লাহ্
বাহা শব্দের অর্থ হল = আলো
উল্লাহ্ হল সৃষ্টিকর্তার নাম = ঈশ্বর
বাহা'উল্লাহ্ = ঈশ্বরের আলো।

তাহলে এখানে পরিস্কার যে, বিষ্ণুযশা আর বাহা'উল্লাহ্ একই ব্যক্তি। শুধু ভাষার কারণে আমরা তাঁকে চিনতে পারছিনা। এখানে আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, দুইজনের নামের অর্থ ''ঈশ্বরের আলো।" আমরা আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে করছি যে, যেহেতু বিষ্ণুযশা আসে নাই তাই আমরা কেন বাহা'উল্লাহকে অবতার হিসাবে মানব।

বিষ্ণুযশা এসে পৃথিবীতে যে কাজটি করবেন সে সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে সুন্দর ভাবে বর্নণা করা হয়েছেঃ

কলিযুগের হরি নাম হইলে বিনাশ।
পাষন্ড সমান দ্বিজ হইলে প্রকাশ ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর যতো বৈশ্য দল।
নাস্তিক হইয়া যবে উঠিবে কেবল ॥
শুদ্রেরা হইবে রাজা পৃথিবীর মাঝার।
স্বাহা স্বধা আদিবাণী উঠিবেনা আর ॥
তখন শ্রী ভগবান ত্রি-ভূবন ভূপ।
ধরিবে কল্কির রূপ অতি অপরূপ ॥
ধরিয়া কল্কির রূপ নাশি দুষ্টগণে।
সত্যযুগ পুনরায় আনিবে ভূবনে ॥
পঞ্চবিংশ অবতার মহা কল্কি নাম।
বৈকুন্ঠ পৃথিবী তবে হবে এক ধাম ॥

এখানে বোঝা যায় যে, যখন কল্কি যুগে মানুষ ঈশ্বরের কথা ভুলে যাবে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় নাস্তিক হয়ে উঠবে,শুদ্ররা পৃথিবীর রাজা হবে। তখন ভগবান কল্কি অবতার হিসাবে পৃথিবীতে আসবেন। তিনি এসে পৃথিবীতে আবার সত্যযুগ ফিরিয়ে আনবেন এবং সারা পৃথিবীটাকে এক করবেন।

এই ভবিষ্যদ্বানীটি হাজার হাজার বছর পূর্বের। তখন পৃথিবীটাকে এক করার কথা কল্পনাই করা যেতনা। কারন তখন গোটা পৃথিবী আবিস্কার হয়নি। তখন পৃথিবীর কোথায় কোথায় মানুষ বাস করতো তা এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল সে যুগে যোগাযোগ ব্যবস্হা ছিল না। মানুষের পায়ে হেটে ছাড়া এক স্হান থেকে অন্য স্হানে যাবার আর কোন পস্হা ছিল না। পায়ে হেঁটে গেলে সামনে জংগল। জংগলে বাস করত বাঘ, সিংহ। গেলেই খেয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় পথ পানি। সামনে পানি দেখলেই মানুষ ভাবতো এর পরে আর কিছুই নাই। কারন তখন পানি পার হবার

কোন যানবাহন ছিলনা। ছিলনা উড়োজাহাজ। পানিতে ছিল বড় বড় কুমির আর অন্যান্য বৃহৎ জলজ প্রাণী। যা মুহূর্তেই একজন মানুষকে খেয়ে ফেলতো। তখন পৃথিবীটা ছিল মানুষ যতোটুকু সামনে দেখতে পেত ঠিক ততটুকুই। সেই সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এটা। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী আজকে সত্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগের অবতার বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন, '' পৃথিবী একটি দেশ এবং মানবজাতি ইহার নাগরিক''। হাজার হাজার বছর পূর্বে করা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হয়েছে। তাহলে আমাদের কাছে পরিস্কার যে, আমরা যে কল্কি অবতারের জন্য অপেক্ষা করছি তিনি ইতোমধ্যেই আমাদের কাছে চলে এসেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি। চিনতে পারিনি আমাদের উদাসিনতা, অজ্ঞতা আর অবহেলার কারণে।

গীতার বাণী অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের যুগের অবতারকে চিনতে পারি তাহলে আমরা মৃত্যুর পরে ভগবানকে প্রাপ্ত হবো। আর যদি না চিনি তাহলে আমাদের পুনঃর্জন্ম হতেই থাকবে। এরপর আমরা কল্কি অবতার বাহা'উল্লাহ্র বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো।

এই ধরনের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন বইতে আছে। যেমনঃ রামায়ন, মহাভারত এবং বিষ্ণু পুরাণ। বাহা'ইরা বিশ্বাস করে যে, হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে বা বর্নণা হয়েছে তার সবগুলি সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা যেই যুগে বসবাস করছি সেই যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। মহান বাহা'উল্লাহ্ বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা এই ভাবে বর্ননা করেছেনঃ " পৃথিবী আজ যন্ত্রনা গ্রস্থ পরিশ্রমে লিপ্ত এবং ইহার আলোড়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মুখ একগুয়েমী ও অবিশ্বাসের দিকে ফিরানো রহিয়াছে। এমন হইবে ইহার দশা যাহা এখন প্রকাশ করা উচিৎ হইবে না। ইহার বিকৃত কাজকর্ম দির্ঘকাল ধরিয়া চলিবে।"

অনেক বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক বাহা'উল্লাহর এই মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, ''বর্তমানের চেয়েও আরো গভীর, নিরানন্দ, কালো, ভারী আচ্ছাদনে তোমাদের এই পবিত্র পৃথিবী আচ্ছাদিত হবে যা পূর্বে কখনোও ঘটে নাই এবং এই পতন হবে এমন পতণ যা পূর্বের সমস্ত পতন বর্তমান পীড়নের কাছে হবে ক্ষুরের সাদৃশ্য। (Complete Works of Swami Vivekananda Vol-6, P-187)

বর্ণ প্রথা সম্পর্কে আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি তাতে দেখি যে, বর্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে এবং ধর্মকে বর্জন করেছে।

''কলিযুগে বর্ণ প্রথা পালন এবং এর নির্দেশ প্রচলিত থাকবে না এবং আচার অনুষ্ঠানও থাকবে না যা শাম, ঋক এবং যযুর বেদে উল্লেখ আছে। এই যুগে বিয়ে হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক হবে লীন। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন হবে নাজুক। আর এভাবেই ঈশ্বরের পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে।"

যখন বৈদিক ধর্ম এবং ধর্ম শাস্ত্র শেষের দিকে উপণীত হবে তখন এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড-এর একপিঠ একটি অংশ.....পবিত্র ঈশ্বর বিষ্ণুযশা তখন দেহ ধারন করে পৃথিবীতে কল্কি অবতার রূপে আগমণ করবেন। (বিষ্ণু পুরাণ, ৪ঃ২৪)

কিন্তু বাহা'ই দার্শনিক এবং মনুস্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রমতে কল্কি অবতারের আগমনের নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়। এই তারিখ হল ১৮৪৪ সাল। যে বৎসর বাহা'ই ধর্ম শুরু হয়েছিল। তাই বাহা'ইরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত পুরুষের প্রতি বিশ্বাসী এবং হিন্দু শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর নথিমতে ঈশ্বর নিজেকে বর্তমান যুগে পুনরায় কল্কি অবতাররূপে প্রকাশ করেছেন। বাহা'ইরা বিশ্বাস করে যে, তিনিই বাহা'উল্লাহ্। বাহা'উল্লাহ্র আগমণের উদ্দেশ্য হল হিন্দু শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা এবং সেই শিক্ষা দেওয়া যাতে পৃথিবীতে সোনালী যুগের সূত্রপাত ঘটে। বিষ্ণু পুরাণে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, '' তিনি তখন পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মানুষের মনকে জাগিয়ে তুলবেন এবং মানুষের মন হবে কাঁচের মতো স্বচ্ছ।

বিভক্ত মানুষ তখন একত্রিত হবে.....এবং এই বসন্তের মাধ্যমেই স্বর্ণ যুগের প্রতিষ্ঠা হবে। (বিষ্ণু পুরাণ)

বাহা'ই ধর্মের বিভিন্ন শিক্ষাসমূহঃ

আমরা এতোক্ষন সনাতন ধর্মের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যে আলোচনা করলাম এখন দেখি সেগুলো বাহা'ই ধর্মের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা?

বাহা'ইরা বিশ্বাস করে যে, বাহা'ই ধর্ম হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করে নাই বা তার স্থান দখল করে নাই। বাহা'ইদের উদ্দেশ্য হল হিন্দু ধর্মকে পুনরায় উন্নতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। কিছু অনৈক্যকে দূর করা এবং সকল হিন্দুক তথা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এক করা।

১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে একটি বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে ভারতের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন সেটা ছিল একটা নতুন ধর্মের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী। সে ধর্ম কেমন হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী এবং কারা সেখানে আশ্রয় পাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী। সেটা অধ্যয়ন করার পরে যদি বাহা'ই ধর্ম অধ্যয়ন করা যায় তাহলে পুরা বোঝা যায় যে, স্বামীজী পরোক্ষ ভাবে বাহা'ই ধর্মের কথাই বলেছিলেন। চলুন আমরা দেখি স্বামী বিবেকানন্দ সেই সম্মেলনে কি বলেছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী বলেছিলেন, '' ভ্রাতৃগণ, হিন্দু হয়তো তাহার সব পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সার্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও একটি দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে। ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য্য কৃষ্ণ ভক্ত, খ্রিষ্ট ভক্ত, সাধু-অসাধু সকলেরই উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্মে শুধু ব্রাহ্মন বা বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বা মুসলমানের হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিরূপ হইবে, অথচ তাহাতে সীমাহীন উন্নতির অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতা বশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নর-নারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে; পশুতুল্য অতি হীন বর্বর হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিস্কের গুণরাশির জন্য যাহারা সমগ্র মানবজাতির উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাহাদের সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া স্বশ্রদ্ধ ভয়ে দন্ডায়মান সেই সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় বক্ষে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নর-নারীর দেবত্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্য জাতিকে দেবত্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।" (শিকাগো বক্তৃতামালা)

বন্ধুগণ, স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাহা'ই ধর্মের মাধ্যমে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। স্বামীজী যা যা আশা করেছিলেন তার প্রত্যেকটি বাহা'ই ধর্মের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। যা পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য কোন ধর্মের মাধ্যমে হয় নাই বা হওয়া সম্ভবও নয়। যদি আপনি বাহা'ই ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করেন তখনই আপনার কাছে বিষয়টি জলের মতো পরিস্কার হয়ে যাবে।

এখন বাহা'ই ধর্মের বিষয়ে কিছু ধারণা দেবার জন্য প্রথমে বাহা'ই ধর্মের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলাপ করছিঃ

১। মানবজাতির একত্বঃ-

বাহা'উল্লাহ্ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ এক জাতির। প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা একজন তাই তার সৃষ্ট জীব মানুষ আলাদা আলাদা হতে পারে না। আমরা পৃথিবীর সকল মানুষ একই পরিবারের বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাহা'উল্লাহ, আমাদের কাছে একতার আলো দেখানোর পুর্বে মানুষ মনে করত যে, একেক মানুষ অন্যের চাইতে আলাদা। এক শ্রেনীর মানুষ মনে করত যে তাদের গায়ের চামড়ার রং সাদা তাই তারা কালো চামড়ার মানুষের চেয়ে উন্নত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। কারণ মানুষের ভিতর যদি কোন তফাৎ থেকে থাকে তবে তা শিক্ষার এবং শ্রেণীবিভাগের তফাৎ। গায়ের রংয়ের কারণে মানুষ মানুষ থেকে আলাদা হতে পারে না। ফুলের বাগানে যেমন নানা বর্ণের ফুল দেখা যায় তেমনি পৃথিবীর মাটিতেও নানা বর্ণের মানুষ নানা রংয়ের ফুলের মতই। বাগানের সমস্ত ফুল একই বর্ণের হলে ভাল লাগে না, বিভিন্ন রংয়ের হলে বেশী ভাল লাগে। আমাদের গায়ের চামড়ার রং যাই হোক না কেন, আমরা যেখান থেকেই আসি না কেন, ঈশ্বর আমাদের সকলকেই সমান ভালবাসেন। আমাদের বিশ্বে অনেক ধর্মের, গোত্রের, পেশার, জাতির, উপজাতির লোক বাস করে। সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অভ্যস্থ এবং তাদের সাংস্কৃতি, পরিবেশ, আচার-ব্যবহার আলাদা। কিন্তু তারা সবাই এই পৃথিবীর বাসিন্দা এবং সবাইকে একই ভগবান সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন। ভগবানের দৃষ্টিতে সবাই সমান। এটাই বাহা'ই ধর্মের উদ্দেশ্য। সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করা। কেননা মানবজাতি একত্রিত না হলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেনা। আর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে পৃথিবী অশান্তি, যুদ্ধ, হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদে ধ্বংস হয়ে যাবে।

২। **সকল ধর্মের একত্বঃ-**

সৃষ্টিকর্তা যেহেতু একজন। তাহলে পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম ইতোমধ্যে এসে গেছে সেগুলো অবশ্যই তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। যদি সকল ধর্মের উৎস একই হয়ে থাকে তাহলে প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে আমরা পুর্বেই বিস্তারিত আলেচনা করেছি।আমরা জানি এই পৃথিবীতে যতো ধর্ম এসেছে তার প্রত্যেকটি ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। প্রত্যেক বার্তাবাহক তাঁর যুগের উপযোগী ধর্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁরা যে সমস্ত ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন তা মূলতঃ এক। ধর্ম দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য নয়। ধর্ম হল একতার জন্য। বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ধর্ম আলাদা আলাদা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের মূল বিষয় একটাই। সে কারণেই বাহা'ইরা সকল ধর্ম এবং তার অনুসারীদের সমান শ্রদ্ধা করে।

৩। **সৃষ্টিকর্তার একত্বঃ-**

আমরা সৃষ্টিকর্তাকে কেউ ভগবান, কেউ ঈশ্বর, কেউ খোদা, কেউ আল্লাহ, কেউ GOD ইত্যাদি নামে ডাকি। সৃষ্টিকর্তা সবার ডাকেই সাড়া দেন এবং তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন। বিরোধ হয় আমাদের মাঝে। ভাষা নিয়ে, আল্লাহ বড় না ভগবান বড়? আসলে দুটি জিনিস তো একই। সুতরাং এখানে বড় ছোটর প্রশ্ন আসে কেন? আমরা এই পৃথিবীতে তাঁরই কৃপায় জন্ম লাভ করেছি এবং তাঁরই কৃপায় আমরা বেঁচে আছি। বিভিন্ন ভাষায় সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন নাম আছে।তিনি সকল নামেই আমাদের ডাকে সাড়া দেন।

৪। **কুসংস্কার অপসারণঃ-**

বর্তমানে সারা বিশ্বের একটি মারাত্মক অসুখ হল কুসংস্কার। কুসংস্কারের মতো দেয়াল পৃথিবীতে আজও সৃষ্টি হয়নি। এই কুসংস্কারই মানুষের বর্ণ, ধর্ম, অর্থনৈতিক, ভাষা, শিক্ষা, জাতি, পেশাকে বিদ্বেষী করে তুলেছে। বাহা'ই ধর্ম হল কুসংস্কার অপসারণের জন্য। আমরা সমস্ত বিশ্বের মানুষকে আপন ভাই বোনের মতো ভাবি। সর্বপ্রকার কুসংস্কারকে ভূলে যেতে হবে। জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলিকে আমাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। মানুষ যতদিন কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। মানুষের মনের কোনও একটি কুসংস্কারের জন্য অতীতে অনেক যুদ্ধ ঘটে গেছে। কত লোককে হত্যা করা হয়েছে। কত রক্তপাত হয়েছে।

কুসংস্কারের কারণেই মানুষ দেশের জন্য, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেছে। পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

৫। বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় ঃ-

ধর্ম হল সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আর বিজ্ঞান হল পৃথিবীকে জানার ও চেনার জন্য। বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হল ধ্বংসের হাতিয়ার তৈরীর কারখানা। যদি বিজ্ঞান ও ধর্ম পাশাপাশি না চলে তাহলে পৃথিবীর উন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের কাছে আমরা পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত জিনিষপত্র। আর ধর্মের কাছে আমরা পাই সেই যন্ত্রগুলি ব্যবহার প্রণালী। কুঠার এবং কাস্তে খুবই প্রয়োজনীয় যন্ত্র। যদি অবশ্য তাকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়। কিন্তু ঘাতকের হাতে এই প্রয়োজনীয় যন্ত্র, মারাত্মক হয়ে উঠে। আজ পৃথিবী বড়ই বিপদে পড়ে গেছে, বিজ্ঞান যাদের হাতে তারাই এই প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি অস্ত্ররুপে ব্যবহার করছে। কারণ হল তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নেই। যে ধর্ম তাদের এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার প্রক্রিয়া শিখাতে পারে। আবার, আমরা যদি বিজ্ঞানকে সম্পর্ণরুপে পরিত্যাগ করি ,মনের সংগে যুক্তিকে একই সাথে কাজে না লাগাই তাহবে ধর্ম অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে পরিণত হবে এবং তার ফলে এই পৃথিবীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্হ হবে।

৬। নারী-পুরুষের সমানাধিকার ঃ-

শুন্যে উড়তে হলে পাখির দুটো ডানারই প্রয়োজন হয়। একটি পাখিকে ধরে যদি তার একটি ডানা কেটে দিয়ে অন্য একটি ডানা দিয়ে উড়তে দেয়া হয় তাহলে অন্য ডানাটি হাজার শক্ত হলেও পাখিটি আর উড়তে পারবে না। বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। নারী-পুরুষের কাজের ধরন, যোগ্যতা,মেধা, দক্ষতা, কম-বেশী থাকতে পারে, কিন্তু সুযোগ পেলে তারাও সমান দক্ষতা দেখাতে সক্ষম। ভগবান বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন যে, ''আগামী দিনগুলিতে নারীরা সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করবে এবং বিশ্বের উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করবে।" নারীরা এই বিশ্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করতে সক্ষম। পুরুষরা নয়। কেননা নারীরা প্রকৃতিগত ভাবে শান্তি প্রিয়। নারী- পুরুষের সমানাধিকার ছাড়া কাঙ্খিত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

৭। আন্তর্জাতিক ভাষাঃ-

পৃথিবীতে ভূল বোঝাবুঝির প্রধান কারণ হল একে অন্যের ভাষা বুঝতে না পারা। প্রতিটি দেশের তথা জাতির ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে মানুষ তার নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে তখন তার কাছে এই দেশটাকে বিদেশ বলে মনে হয়। এই পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা রয়েছে। যা শেখা একজন মানুষের পক্ষে সারা জীবনেও সম্ভব নয়। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারা না পারার উপর নির্ভর করে বন্ধুত্ব স্থাপন। যদি কথাই না বলতে পারে তাহলে বন্ধুত্ব স্থাপন হবে কি করে? আর যদি বন্ধুত্বই প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিভাবে? তাই বাহা'উল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজের ভাষার পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা থাকবে যা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যালয়গুলোতে শেখানো হবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে মাত্র দুইটি ভাষা শিখতে হবে, একটি মাতৃভাষা ও অন্যটি আন্তর্জাতিক ভাষা। তাহলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাতে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভাষা বহু প্রকারের হওয়ার ফলে অনেক সময় মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা মারাত্মক বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। উদাহরণ স্বরুপ আমাদের সৃষ্টিকর্তার নামটাকেই ধরা যাকঃ বাংলা ভাষায় আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলি। আরবী ও উর্দূতে আল্লাহ্ বলি। ইংরেজীতে বলি গড। অজ্ঞ ও মূর্খরা মনে করে গড, ঈশ্বর, আল্লাহ্ এক নয়। তাই তারা ই প্রভেদ নিয় পরস্পর মারামারি করে থাকে। যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটি সার্বজনীন ভাষা শিখবে সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, তারা সকলে একই সৃষ্টিকর্তাকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে থাকে। এইভাবেই সকলের ভির থেকে ভূল বোঝাবুঝির অবসান হবে।

৮। **স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণঃ-**

বাহা'ই ধর্মে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিকর্তার বার্তাবাহককে খুঁজে বের করার জন্য স্বাধীন। এই বিশ্বে অধিকাংশ মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষ, ধর্মীয় নেতা বা অন্যেরা কে কি ভাববে তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন, ''তুমি সত্য নিজে খুঁজে বের করবে ও তা দর্শন করবে।''

আমরা সচারাচর দেখি যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পরিবারে যদি একটি শিশু জন্মগ্রহন করলে সেই শিশুটি প্রথানুসারে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়। মুসলমান পিতা মাতার সন্তান মুসলমানই হয়। হিন্দু সন্তান হিন্দুই হয়ে থাকে। কেন এমন হয়? এর একমাত্র কারণ হল পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই তাদের পূর্বের চৌদ্দপুরুষের আদব কায়দা অনুকরণ করে থাকে। মানুষ যদি এই অন্ধ অনুকরণ প্রথা চিরকাল অনুসরণ করে চলে তবে কোনও দিনই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। মানুষ এই অনুকরণের প্রথাটি নিয়েই বড়াই করে থাকে। সকলেই দাবী করে যে, তিনিই একমাত্র সেই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছেন এবং সকলেই যা করছে, সে সবই ভূল। মানুষ কখনও এক মুহুর্ত চিন্তা করে দেখে না যে তারা যদি ভিন্ন মতাবলম্বী সংসারে জন্মগ্রহন করত, তবে তাদের চিন্তাধারাটি একেবারেই অন্যরকম হত, আজকের সত্য বিশ্বাসের রুপটিও আর এক রকম হত।

আমরা কেউ লাল রংয়ের কাঁচের জানালার বাড়ি, কেউ হলুদ রংয়ের,কেউ সবুজ রংয়ের, কেউ নীল রংয়ের, কেউ বেগুনী রংয়ের কাঁচের জানালার বাড়ীতে বসবাস করি। আমরা যদি ঘরের ভিতর থেকে সূর্য্য দেখি তাহলে নিশ্চই একেক জন ব্যক্তি সূর্য্যকে একেক রংয়ে দেখব। কেউ দেখব লাল, কেউ হলুদ, কেউ সবুজ, কেউ নীল আবার কেউবা বেগুনী। আসলে কি সূর্য্যকে এতগুলো রংয়ে দেখা যায়? কোন দিনই না। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত সূর্য্যকে দেখতে চাই তাহলে আমাদের ঘরের জানালা অপসারণ করতে হবে। তবেই আমরা সূর্যের প্রকৃত রংকে দেখতে পারব। ঠিক তেমনি যদি আমরা আমাদের মনের রংগীন কুসংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলি বা কুসংস্কার থেকে বাইরে আসি তাহলেই আমরা প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পাব। আমরা সকলে যদি নিজেরাই সত্যানুসন্ধানে রত হই তবে আমরা দেখতে পাব যে, সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। সেই অদ্বিতীয় সত্যই আমাদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং অতীতের পার্থক্যগুলিকে ভূলে যেতে সাহায্য করবে।

৯। **সার্বজনীন শিক্ষা ঃ-**

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ বলেছেন যে, ''প্রত্যেকটি মানুষ একটি মূল্যবান রত্ন''। বাহা'ই ধর্মে লেখাপড়া করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষা দুই ধরনের, একটি হল আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জ্ঞান, অন্যটি প্রাতিষ্ঠানিক যা আমরা বিদ্যালয় থেকে পাই। আমাদের জন্য দুইটারই দরকার আছে। আমরা আমাদের সন্তানদের কখনই বলতে পারিন া যে, তারা লেখাপড়া ছেড়ে ঘরের কাজ বা অন্য কোন কাজ করুক। মনে রাখেতে হবে যে, ঈশ্বর শিক্ষাগ্রহণ করার জন্যই আদেশ দিয়েছেন। তিনি শিশুদেরকে ঘরের কাজ বা অন্য কোন কাজ করতে বলেননি। আমাদের সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তাদের অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। কেবল লিখতে এবং পড়তে পারাটাই বাহা'উল্লাহ্র মতে শিক্ষা নয়। শিশুদের এমনভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা মানবজাতির সেবা করতে পারে। বর্তমানে শিশুদের যেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে তারা শুধুমাত্র তাদের নিজের দেশের প্রতিই অনুগত হচ্ছে। পক্ষান্তরে তার মনে অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। বাহাই ধর্মানুসারে এই পদ্ধতি সঠিক নয়। নর-নারীকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তারা বিমশ্বাস করে যে,'' পৃথিবী একটি দেশ মানবজাতি ইহার নাগরিক''। তারা যেন পৃথিবীর উন্নতির জন্য তাদের সমস্ত প্রেম ও সেবা দিয়ে যেতে পারে। মানুষ যদি এই সুন্দর শিক্ষা গ্রহন করে তাহলে তাদের এক পুরুষ বাদেই পৃথিবীতে মানজাতির একতা প্রতিষ্ঠত হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে।এছাড়াও আরো অনেকগুলি বিষয়ের সহজ সমাধান রয়েছে বাহা'ই ধর্মে।

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ ঃ

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ (বিষ্ণুযশা) ১৮১৭ সালের ১২ই নভেম্বর ইরানের রাজধানী তেহ্রানের একটি উচ্চ সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর জ্ঞান এবং পান্ডিত্যের জন্য তার পিতার রাজ সভায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বাহা'উল্লাহ্র বয়স যখন মাত্র ২২ বছর তখন তাঁর বাবা স্বর্গারোহণ করেন। ইরানের নিয়ম অনুসারে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইরানের মন্ত্রী হবার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সরকার ভাবল যে, এই অসাধারণ প্রতিভাবান যুবগ মন্ত্রীত্ব পরিচালনায় যথেষ্ট উপযুক্ত হবে। কিন্তু তিনি জাগতিক মোহে লোভ করেন নাই। ঈশ্বরের মানুষ তিনি, তাই রাজকীয় বিলাসর জীবনযাত্রা তাঁর ভাল লাগল না। কারন তিনি জানতেন যে তিনি হবেন এই বিশ্বের মানুষের অধিপতি। তাই তিনি ক্ষুদ্র মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বাহা'উল্লাহ রাজসভা এবং মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব ত্যাগ করে ঈশ্বরের দেখানো পথে যাত্রা শুরু করলেন।

তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিকে বেশ সুখ-শান্তি ও মান-সম্মান নিয়ে রাজপুত্রের মতো জীবন যাপন করেন।

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ ছিলেন সর্ব ধর্মের প্রতিশ্রুত মহামানব। যিনি হিন্দুদের 'বিষ্ণুযশা',বৌদ্ধদের 'অমিতাবাহা', খ্রিষ্টানদের 'গ্লোরী অব গড' ও মুসলমানদের 'ঈশা (আঃ)' এর আগমণ। তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে মানবজাতি মুক্ত হবে এবং এই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

বাহা'উল্লাহ্ আমাদের জন্য এবংব আগামী দিনের আগত বংশধরদর জন্য প্রচন্ড দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। কুসংস্কার,গোঁড়ামি এবং শত্রুতার বন্ধনশৃংখল থেকে আমাদের মুক্ত করতে তিনি নিজের পবিত্র গলায় ভারী লৌহশৃংখল বহন করেছিলেন। তার পিতার সমস্ত সম্পদ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করার পরে তাঁকে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে প্রেরণ করেন। বাগদাদে তাঁর ধর্ম প্রসার শুরু হলে সরকার পুনরায় ভীত হয়ে তাঁকে তুরস্কে পাঠিয়ে দিলেন। বাহা'উল্লাহ্র মহান জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের মোহিনী শক্তি বিপুল সংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করেছিল। তখন ধর্মোম্মাদ মোল্লারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাহা'উল্লাহকে আদ্রিয়ানোপলে প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে তাঁকে আক্কায় প্রেরণকরা হয়। সে সময় আক্কা ছিল, খুনী, চোর, বদমাইশ, এবং ডাকাতদের যাবজ্জীবন কারাভোগের বন্দী আবাস। বসবাস করার জন্য আক্কা ছিল একটি ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক জায়গা। বাহা'উল্লাহকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত বন্দী হিসাবে আক্কা নগরীতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৯ বৎসর বাদই তিনি কারাগার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছা করলেন। এই ৯ বৎ.রের ভির তাঁরমহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব স/কলেই তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিল। কঠিন হৃদয় কারাধ্যক্ষ পর্যন্ত বাহা'উল্লাহ্র পরম হিতৈষী হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন কারাগার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তখন কেউ তাঁকে বাধা দিলনা। কারাগার ছেড়ে তিনি আক্কা শহরের বাইরে এসে তাঁর শেষ জীবনটা কাটালেন।

ভগবান বাহা'উল্লাহ্ ১৮৯২ সালের ২৯শে মে, প্যালেষ্টাইনের আক্কা নগরীতে স্বর্গারোহণ করেন।

বাহা'উল্লাহ্ই ঈশ্বরের মহাপ্রকাশ, যাঁর কথা অতীতের সমস্ত অবতারগণ তাদের ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। সর্বযুগের ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মগুলি মানুষকে জীবনের একই উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিয়ে, একই পথে বাহাই ধর্ম বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছে। যেন বহু নদী একই সাগরে এসে মিলিত হয়েছে। এক একটি নদীর জলে হাজার হাজার একর কৃষিভূমিতে জল সেচন করা হয়, কিন্তু তাই বলে কোনও একটি নদী, বিরাট এবং শক্তিসম্পন্ন মহাসাগর হতে পারে না, কারণ সাগরেই এসে সমস্ত নদী একত্রে মিলিত হয়। সমস্ত ধর্মের বহু, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাহাই ধর্মসংঘে এসে একত্রে মিলিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে এরা এসে এই মহান ভাতৃত্বে এবং এক সমন্বিত ধর্মূ বিশ্বাসে পরস্পরের সংগে হাত মিলিয়েছেন। এভাবেই ঈশ্বরের মহাসাগরে বহু নদীর জল এসে মিলিত হয়ে এক হয়ে গেছে।

বাহা'উল্লাহ্ আমাদের মুক্তির জন্য, আমাদের শান্তির জন্য তাঁর সারাজীবন ধরে কষ্ট করে গেছেন। তিনি নিজে মন্ত্রীত্বের পদ ছেড়ে মানবজাতির জন্য শৃংখলাবদ্ধ হয়েছেন যেন মানবজাতি মুক্তি পেতে পারে। তিনি নিজে বন্দী থেকেছেন, যেন মানবজাতি মুক্তির স্বাদ পেতে পারে।

বাহা'ইরা কোন্ কোন্ দেশে আছেঃ

বাহা'ই ধর্ম বর্তমানে প্রায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দ্বীপে বাহা'ই ধর্ম পৌঁছেছে। যার পরিমান, দেশ হিসাবে ৩৪৩ টি, অঞ্চল হিসাবে ১,৩১,৯৩৩ টি। তার মধ্যে বাহা'ই ধর্ম ১৯০টি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮২টি দেশে বাহা'ইদের জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ আছে। ২১১২ টি জাতি, উপজাতি, আদিবাসীর লোক বাহা'ই সমাজে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিশ্বের ৯০০টি ভাষায় বাহা'ই ধর্মের পুস্তকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সাথে বাহা'ই সমাজের সম্পর্কঃ

বাহা'ইরা জাতিসংঘের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ''জনতথ্য কার্যালয়'' এর সঙ্গে জড়িত। বাহা'ই সমাজের ১৮২টি দেশের বেসরকারী প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ১৯৪৭ সালেই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক (ECOSOC) এর পরামর্শ দাতার এবং ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (UNICEF) এবং আশির দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এর পরামর্শদাতার মর্যাদা লাভ করে। এছাড়াও বাহা'ইরা নিউইয়র্ক ও জেনেভায় সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের এবং নাইরোবিতে''পরিবেশ কর্মসূচিতে''(Environment Program) এর প্রতিনিধি রয়েছে।

বাহা'ই উপাসনালয়ঃ

বাহা'ই উপাসনালয় হল প্রার্থনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান। অন্যান্য উপাসনালয়ের চাইতে বাহা'ই উপাসনালয়ের কিছুটা ভিন্নতা আছে। আর সেই ভিন্নতা খুবই সুন্দর। বাহা'ই উপাসনালয় শুধুমাত্র বাহা'ইদের জন্য নয়। যেহেতু বাহা'ইরা মানবজাতির একতায় বিশ্বাসী তাই বাহা'ই উপাসনালয় যে কোন ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত। যেখানে সকল ধর্মের বই আছে। যে কোন লোক বাহা'ই উপাসনালয়ে গিয়ে বই অধ্যয়ন করতে পারে এবং নীরবে তাদের প্রার্থনা পাঠ করতে পারে।

অন্যদিকে প্রত্যেকটি বাহা'ই উপাসনালয় বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পেরও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একটি বাহা'ই উপাসনালয়ের সাথে অন্য বাহা'ই উপাসনালয়ের কোন সাদৃশ্য নাই। এক একটি বাহা'ই উপাসনালয় স্থাপত্য শিল্পের এক একটি বৈচিত্রপূর্ণ প্রতীক। বর্তমানের সারা বিশ্বে বাহা'ইদের উপসনালয়গুলো যেসব দেশে আছে সেগুলো হলঃ উইলমেট (যুক্তরাষ্ট্র), কাম্পালা (উগান্ডা), সিডনী (অষ্ট্রেলিয়া), ফ্রাঙ্কফুর্ট (জামার্নী), নয়াদিল্লী (ভারত), পানামা শহর এবং এপিয়া, পশ্চিম সামোয়ায়। এছাড়াও সারাবিশ্বে ১২০ টি দেশে বাহা'ই উপাসনালয় নির্মানের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।

ভগবান বাহা'উল্লাহ্র কিছু পবিত্র বাণীঃ

- ❖ সর্ব প্রশংসার মালিক মহা প্রভুর নাম উচ্চারণ করা এবং তিনি ব্যতিত অপর সকল বস্তু বিস্মরণ করা প্রকৃত স্মরণ কার্য্য।
- ❖ সেবকের পক্ষে এই জগতে আপন বৃত্তি অনুসরণ করা। আপন প্রভুকে আঁকড়াইয়া ধরা। প্রভুর কৃপাভিন্ন অপর কিছুর আকাঙ্খী না হওয়াই প্রকৃত নির্ভরশীলতা, কেননা সেবকগণের ভাগ্য তাহারই হস্তে।
- ❖ মানবগণের জন্য আপন প্রভুর প্রাঙ্গনের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকা। তাঁহার সান্নিধ্যে প্রবেশ করা। তাঁহার মুখ মন্ডল নিরীক্ষণ করা এবং তাঁহার সম্মুখে সাক্ষীর ন্যায় দন্ডায়মান থাকা প্রকৃত বৈরাগ্য।

- ❖ সেবকের পক্ষে আপন প্রভুর দান উপহার বিবৃত করা এবং সর্ব সময়ে ও সর্বাবস্থায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক।
- ❖ বাক্যের স্বল্পতা এবং কর্মের আধিক্যই বিশ্বাসের পরিচায়ক। যাহার বাক্য তাহার কর্মকে অতিক্রম করে, জানিয়া রাখ তাহার জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।
- ❖ প্রভু হইতে বিমুখ হওয়া এবং অপবিত্র বস্তুর অনুরাগী হওয়া মানবের পক্ষে সকল অমঙ্গলের হেতু।
- ❖ সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনে অবিশ্বাস করা; যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া অনর্থক বাদানুবাদ করা, তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা করা অতি দগ্ধকরা জলন্ড় অগ্নি।
- ❖ সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানই সকল জ্ঞানের উৎস। তাঁহার জ্ঞানের মধ্যস্থতা ব্যতিত ইহা লব্ধ হইতে পারেনা। কৃপাময়ের ছায়াতল হইতে চলিয়া যাওয়া এবং শয়তানের আশ্রয় প্রার্থী হওয়া অধঃপতনের কারণ।
- ❖ যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে তখন তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী শান্তির ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ কর, ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী ভালবাসার মনোভাব দ্বারা অবশ্যই ধ্বংস করিতে হইবে।
- ❖ অচিরেই বর্তমান দিনের নিয়ম-কানুন গুটাইয়া লওয়া হইবে এবং তার স্থলে নতুন নিয়ম-কানুন প্রদান করা হইবে।